চিকিৎসা
বিজ্ঞানের
আজব কথা
পার্থসারথি
চক্রবর্তী

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের
আজব কথা

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আজব কথা

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

গোড়ার কথা

রোগ যেমন রকমারি আছে, তার প্রতিকারও আছে অনেক রকম। আজকাল চিকিৎসার জন্য আগেকার মতো প্রেসক্রিপসন বড় একটা লিখতে হয় না। দোকানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষাও করতে হয় না ওষুধ তৈরীর জন্যে। ওষুধ তৈরীই আছে—পিল, ক্যাপসুল, পেস্ট, ইনজেক্সন্ এইসব। এটা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটা অদ্ভুত সাফল্য। কি ক'রে কয়েক বছরের মধ্যে এই সাফল্য এল, সে এক তাজ্জব ব্যাপার!

আজকের দিনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অদ্ভুত সব আবিষ্কার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা কাজের কথা নয়। আকস্মিক দুর্ঘটনা সকলের জীবনেই ঘটতে পারে, ব্যাধিও যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে। এর প্রতিকারের জন্য ডাক্তার আছেন একথা সত্যি। কিন্তু ডাক্তার ত' আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারেন না! কাজেই ব্যাধির প্রারম্ভিক চিকিৎসা—কোন্ রোগের কোন্ ওষুধ এটা মোটামুটিভাবে আমাদের অল্প বয়স থেকেই জানা দরকার।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আজব কাহিনীগুলি এই বইতে কিশোর বয়স্কদের জন্য গল্পের মতো ক'রে লেখা হয়েছে।

এই বইখানি লিখতে আমার পিতা এবং পিতৃবন্ধু অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য আমাকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করেছেন। সেজন্য আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

গেট রোড
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

পার্থসারথি চক্রবর্তী

সূচীপত্র

এই লেখকের অন্যান্য বই

কেমিক্যাল ম্যাজিক
রসায়নের ভেল্‌কি
ম্যাজিকের মতো মজা
তত সহজ ছিল না
মজার এক্সপেরিমেণ্ট
বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা
পদার্থ বিজ্ঞানের খোশ খবর
ছোটদের বিজ্ঞানকোষ

চিমনী ডাক্তার হয়েছে। হবেই তা আমরা জানতাম। ছেলেবেলায় সে আমাদের সঙ্গে পড়ত। তার আসল নাম কিন্তু চিমনী নয়। তার আসল নাম দেবব্রত। আমাদের ইস্কুলের কাছে একটা কিসের যেন কারখানা ছিল। কারখানাটাকে দেখা যেত না—কিন্তু তার চিমনীটাকে দেখা যেত অনেক দূর থেকে। অনেক ছেলের মধ্যে দাঁড়ালে দেবব্রতর মাথাটাই নজরে পড়ত আগে। এইজন্য আমরা তাকে 'চিমনী' বলে ডাকতাম। সে কিন্তু তাতে রাগত না কোনদিন। আমাদের হাতের নাড়ী দেখা ছিল তার একটা খেয়াল। তার উপরে যদি কেউ জ্বর-টর হয়েছে বলত, তাহলে আর রক্ষা ছিল না! সে তার চোখের নীচের পাতা টেনে দেখত, 'পাল্স' দেখত, তারপর বলত—দেখি জিভ!

চিমনী ভালোভাবে ডাক্তারী পাশ করবার পর আমাদের পাড়ায় একদিন এসেছিল। তখন ছেলেমেয়েরা সবাই তাকে ধরল—তার ডাক্তার হওয়ার গোড়ার গল্প বলতে হবে।

চিমনীর কথা

বিবেকানন্দ ছেলেবেলায় একবার তাঁদের বৈঠকখানা ঘরের বিভিন্ন জাতের হুঁকো টেনে দেখেছিলেন—তা দিয়ে জাতের পার্থক্য বুঝা যায় কিনা। না, তা যায় না—কারণ মানুষ সবই এক। আমারও ছেলেবেলায় রোগীর 'পাল্স' দেখা নিয়ে একটা খট্‌কা লেগেছিল। আমি ভাবতাম হাতের পাল্স সকলেরই ত' এক এবং তারা একই রকম বিট দেয়। এর থেকে পার্থক্য কি করে বুঝা যাবে? অথচ তখন প্রায়ই শুনতাম, অমুক কবিরাজ নাড়ী দেখে বলে দিতে পারতেন রোগী কবে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, অমুক ডাক্তার নাড়ী দেখেই রোগীর সমস্ত ইতিহাস বলে দিতে পারতেন—এইসব। তাই আমি ছেলেবেলা

থেকেই যাকে পেতাম তারই হাত দেখতাম। এই বিদ্যাটি বড় সহজ বিদ্যা নয়। ধা করে কখনও কার নাড়ী জ্ঞান হয় না। সেজন্য অক্লান্ত সাধনা আর ধৈর্যের দরকার। সব মানুষ এক বলে তাদের হুঁকোর জল এক হতে পারে কিন্তু সব মানুষ এক বলে তাদের নাড়ীর গতি সব সময় এক নয়।

আমার দাদু ছিলেন বড় ডাক্তার। তাঁর কাছে গল্প শুনেছিলাম। গল্প হ'লেও এটা সত্যি ঘটনা। তাঁর নিজের কথাতেই বলিঃ

তখন ইস্কুলে পড়ি। একদিন রাণাঘাটে গিয়েছিলাম ফুটবল ম্যাচ খেলতে। ফিরবার পথে রাণাঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফরমে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গেল আমার এক বন্ধু। পড়েই অজ্ঞান! কিছুতেই আর জ্ঞান হয় না। তখন তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হ'ল রাণাঘাট মিশনারী হাসপাতালে। ওখানকার 'আরচার' আর 'ফ্লিন্ট্' সাহেব তখন স্বনামখ্যাত ডাক্তার। রোগীকে টেবিলের উপর রাখা হল। আমাদের কাউকেই সেখানে থাকতে দিলেন না তাঁরা। যারা খেলতে গিয়েছিল তাদের অনেকেই রাত্রের শেষ ট্রেনে ফিরে গেল বাড়ী। কেবল আমি আর দুজন বন্ধু রয়ে গেলাম স্টেশনের ওয়েটিং রুমে।

রাত্তির দশটায় গিয়ে দেখি ডাক্তার রোগীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছেন টেবিলের কাছে। খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এলাম। রাত্তির বারোটার সময় আবার গেলাম হাসপাতালে। গিয়ে দেখি তখনও জ্ঞান হয়নি রোগীর। আরচার সাহেব রোগীর টেবিলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছেন! দেখে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। ছ' ঘণ্টা পার হলে গেছে, এখনও রোগীর জ্ঞান হ'ল না,—আর ডাক্তার হাঁটু গেড়ে যীশুর ভজনা করছে! এটা কি তাঁর সাধন-ভজনের সময়? রোগীকে নিয়ে ছেলেখেলা নাকি! আমরা তার বাপ-মাকে কৈফিয়ত দেবো কি? নার্স বাইরে এসে আমাদের জানালো—রোগীর অপারেশন হবে এখন—আপনারা বাইরে অপেক্ষা করুন গিয়ে। হরি হরি বল!—অপারেশন ত' ফোঁড়া-টোড়া হলেই করে জানি, অজ্ঞান হয়েছে তার অপারেশনের কি আছে! ওষুধ খাইয়ে, কি ইন্‌জেকসন্ করে জ্ঞান ফিরিয়ে দাও! রাত্তির দুটোর সময় গিয়ে দেখি রোগী অন্য একঘরে বিছানায় শুয়ে। তার মাথায় ব্যান্ডিজ—কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরেছে তার। আমাদের সাথে বেশ সুস্থ মানুষের মতই কথা বলল। কি করে কি হয়েছে সে কিছুই জানে না, দুর্বলতা বোধ করছে খুব।

ভাবলাম, এই ডাক্তারটি মানুষ না দেবদূত? কি ধীর স্থির এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী এই লোকটি। একজন অজ্ঞাত অখ্যাত রোগীর জন্যে এত সময় ব্যয় করেন কোন্ ডাক্তার? কোন্ ডাক্তারের এতখানি পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে যে, রোগীর মাথার একটা শিরায় সামান্য অপারেশন

করলেই তার জ্ঞান ফিরে আসবে তা ধরতে পারেন?

কত বড় মহৎ এই ডাক্তার!

সেইদিন থেকে আমার জীবনের গতি ফিরে গেল। আমার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল—ডাক্তার হওয়া। আরচার সাহেব আমার চোখের সামনে যে মহৎ আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তাতেই আমি বুঝলাম, দুনিয়ায় চিকিৎসা বিদ্যার চাইতে বড় কাজ, মহৎ কাজ আর কিছুই নেই।

এটা হ'ল আমার দাদুর কথা। আমিও কিন্তু তাঁর ঐ কথায় ডাক্তার হবো এটা গোড়া থেকেই ঠিক করে ফেলেছিলাম। সকলেই জানে, পাড়ার কোন বাড়ীতে ডাক্তার এলে আমি ইস্কুল কামাই করে ছুটে যেতাম সেখানে। ডাক্তারকে যত রকমে সাহায্য করতে হয় আমি তা' করতাম। এইভাবে ডাক্তার মহলে আমি বেশ পরিচিত হয়ে পড়ি। কোনও ডাক্তার দূরের কোন গ্রামে গেলে প্রায়ই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

আমাদের বাড়ীর ডাক্তার ছিলেন চিন্তাহরণবাবু। এমন শান্ত, সহাস্য বদন ডাক্তার দেখা যায় না। তিনি বাড়ীতে এলে সত্যিই বাড়ীর লোকের যেন চিন্তা-ভাবনা সব দূর হয়ে যেত! আমি সব সময় তাঁর অনুসরণ করতাম। ডাক্তারী ডাক্তারী খেলা আমার খুব ভালো লাগতো। নকল রোগীর পাল্‌স দেখে, পেঁপের ডাঁটার নল দিয়ে তার বুক-পিঠ দেখে, গম্ভীর হয়ে বলতাম—জিভ দেখি। তারপর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসতাম প্রেসক্রিপসন লিখতে। প্রথমেই একটা ইংরাজী R-এর মতো লিখে নিতাম। আমার ধারণা ছিল,—এটা প্রেস-ক্রিপসনেরই সাংকেতিক চিহ্ন এবং 'পি' ও 'আর' একসঙ্গে থেকে এটাকে প্রেসক্রিপসন বুঝাচ্ছে। কিন্তু অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম এর মানে এখানে 'Receipe'—অর্থাৎ ওষুধের দোকানকে বলা হচ্ছে, এইসব জিনিষ দিয়ে ওষুধ তৈরি কর।

রোগীর চিৎকারে ভ্রূক্ষেপ নেই—জল্লাদের মতো তার বুকে পেটে ছুরি চালিয়ে যেতে দেখে ডাক্তারদের মাঝে মাঝে যে আমি নৃশংস মনে করিনি তা নয়। কিন্তু এও দেখেছি দরিদ্রের কাছ থেকে ডাক্তার এক পয়সাও নেননি—এমন কি তাঁকে অনেক অসহায় রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ এবং পথ্য কিনবার পয়সা পর্যন্ত দিতে দেখেছি।

ছেলেবেলা থেকেই এদিকে ঝোঁক থাকায় আমি অনেক কিছু জেনেছি। আমি দেখেছি অনেক লোক রক্ত দেখে মূর্ছা যায়। ডাক্তার-দের কিন্তু রক্তপাতে ভয় করলে চলবে না। ডাক্তার যেমন দৃঢ় হবেন তেমনি হবেন সহানুভূতিশীল। ডাক্তার হতে গেলে অনেকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। সেগুলি ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস করলেই সব-চেয়ে ভালো। চিকিৎসকের একটি মস্ত বড় গুণ ধৈর্য—এটি না হলে

পেটে যত বিদ্যেই থাক,—কোন কালেই ভালো ডাক্তার হওয়া যাবে না।

ডাক্তার হতে গেলে ভূতের ভয় ছাড়তে হবে। ডাক্তারী পড়তে গিয়ে অনেক ছাত্র নরকঙ্কাল দেখে চম্‌কে ওঠে, টেবিলে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করতে গেলে অনেক সময় শিরার প্রসারণের জন্য মৃতের হাত-পা নড়ে উঠতে পারে। তাই দেখে ভয়ে পালালে চলবে না।

ডাক্তার এমন হবেন যে, রোগীর পাশে এসে দাঁড়াতেই রোগীর হতাশা ভাবটা কেটে যাবে। ডাক্তারের সহানুভূতিশীল কথাবার্তায় এবং মিষ্টি ব্যবহারে রোগীর মনে হবে, সে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।

আমাদের দেহ যেন একটি আধুনিক বাড়ি

বাড়িতে থাকে আড়া-বরগা, দেওয়াল, পলস্ত্রা বা বহিরাবরণ, জলের নল, পাম্পকল, বায়ু চলাচলের যন্ত্র, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, পায়খানা এবং আরও থাকে টেলিফোন, বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতি। আমাদের শরীরেরও হাড়গুলি যেন আড়া-বরগা, পেশী যেন দেওয়াল আর চামড়া যেন চূণ-বালির পলস্ত্রা। রক্তনালীগুলিকে জলের নল এবং হৃৎপিণ্ডকে তার পাম্পকল বলা যেতে পারে। ফুসফুসকে বায়ু চলাচলের যন্ত্র আর পাকস্থলীকে রান্নাঘর বলা যেতে পারে। যকৃৎ যেন ভাঁড়ার, মূত্রাশয় ও জলাশয় যেন ড্রেন পায়খানা। আমাদের মস্তিষ্ক টেলিফোন কেন্দ্র এবং স্নায়ুগুলি যেন ওর বৈদ্যুতিক তার। বাড়ির লোহার সিন্দুকে থাকে গৃহস্বামীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ। আমাদের দেহেরও সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। সেটা থাকে বুকের পাঁজরায় হাড়ের তৈরি শক্ত একটা খাঁচার মধ্যে।

দেহের সঙ্গে আধুনিক বাসগৃহের এই সাদৃশ্যটা সত্যিই বিস্ময়কর। কিন্তু তবু তাদের পার্থক্যও কম নয়। বাড়িটা দেহের মত আপনা থেকে বৃদ্ধি পায় না, চলে ফিরে বেড়াতে পারে না, তার কোন সুখ-দুঃখ বোধ বা অনুভূতিও নেই।

পল্লী অঞ্চলের চালাঘরই কর আর শহরের আধুনিক পদ্ধতির ঘরই কর—আগে কতকগুলি খুঁটি, আড়া-বরগা অথবা লোহার স্ট্রাকচার করে নিতে হয়। আমাদের দেহও ঐ রকম একটা হাড়ের স্ট্রাকচার। মজ্জা, শিরা প্রভৃতি অন্যান্য জিনিস দিয়ে ওটা গঠিত হয়েছে। আমাদের এই সুশ্রী দেহটা থেকে চর্ম, মেদ, শিরা-উপশিরা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, চোখ, নাক প্রভৃতি তুলে নিলে যেটা থাকে সেটা মোটেই সুশ্রী নয় দেখতে—আঁতকে উঠতে হবে দেখলে সেই নরকঙ্কাল।

তোমরা যখন ফুটবল খেলো, তখন একজনই বলটা নিয়ে ছুটাছুটি কর না। এগারজন প্লেয়ার প্রত্যেকেই নিজের কাজ কর, পরস্পর সহযোগিতা কর এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

আমাদের দেহেরও প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্দিষ্ট কাজ করবার আছে। এদের একটি অপরকে সাহায্য করে। যেমন খাদ্য হজম করবার কাজে মুখ, দাঁত, জিভ, গলনালী ও পাকস্থলী একযোগে কাজ করে। তেমনি নাক, কণ্ঠনালী ও ফুসফুসের যোগাযোগে শ্বাস-প্রশ্বাস সাহায্যে শরীরের দূষিত বায়ু দূরীভূত হয়ে বিশুদ্ধ বায়ু শরীরে যায়।

আমাদের শত্রু রোগ

আমরা সকলেই স্বাস্থ্য চাই। রোগকে আমরা চাই এড়িয়ে চলতে। রোগ হলে আমরা কাজে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ি। তখন দুশ্চিন্তা আসে মনে এবং জীবনটা হ'য়ে পড়ে দুঃখময়।

দেখা যাক্ বা না যাক্,—রোগ আমাদের দেহের যে কোনও জায়গায় হতে পারে। একমাত্র খাদ্যের দোষেই যে আমাদের রোগ হয়, তা ঠিক নয়। অধিকাংশ রোগই অতি ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে, দেহযন্ত্রের গোলযোগে, ভিটামিনের অভাবে এবং আরও অনেক কারণে হয়ে থাকে।

জল আর বাতাস আমাদের জীবন রক্ষায় বড় সহায়। আবার এই জল-বাতাসের মাধ্যমেই কত রোগ জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। বাতাসের মধ্যে আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জীবাণু। আমরা যেন চারদিকে অজস্র শত্রু নিয়ে বাস করছি! ট্রেনের কামরায় লেখা থাকে—নিজের নিজের মালের প্রতি নজর রাখো। চোর, জুয়াচোর, গাঁটকাটা তোমার নিকটেই আছে। কিন্তু ট্রেনের বাইরে কি করে আমরা এত চোর-জুয়াচোর ও গাঁটকাটা রোগ জীবাণুর মধ্যে বেঁচে আছি—ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়!

কিন্তু ব্যাধিকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থাও দেহের মধ্যে অনেকগুলি আছে। বাইরের রোগ জীবাণুকে দেহের চামড়াটা বাধা দেয় সর্বপ্রথম। অবশ্য চামড়ায় কোন ক্ষত থাকলে রোগ-জীবাণু সেখান দিয়ে সহজে ঢুকতে পারে। ঢুকে প'ড়ে তারা রক্তকে দূষিত করতে এবং নিজের বংশবৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু রোগ-জীবাণু শরীরে ঢুকে পড়া মাত্রই দেহ তার সুরক্ষিত সৈন্য শ্বেত রক্তকণিকাগুলিকে কাজে লাগিয়ে দেয়। তারা জীবাণুগুলিকে প্রথমে ঘেরাও করে তারপর চেপে ধরে তাদের সাবাড় করে দেয়। কিন্তু রোগ জীবাণুর সংখ্যা যেখানে বেশি, যেখানে তারা অধিক শক্তিমান—সেখানে শ্বেতকণিকাগুলি তাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। দেহকে তখন রোগে কাবু করে ফেলে।

জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) ঃ আমাদের যতরকম অসুখ-বিসুখ তার জন্য আসল দায়ী হচ্ছে কতকগুলি জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া। পচা জিনিষ, ময়লা আবর্জনা এবং যেখানে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে সেখানকার জলে বা বাতাসে এই জীবাণুর খুব প্রাদুর্ভাব। মাছিতেও

এদের পরিবহণ করে। এই জীবাণুগুলিই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় রোগ ছড়িয়ে দেয়। লুই পাস্তুর নামে এক প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী এই জীবাণুর তথ্য আবিষ্কার করে বিজ্ঞান-জগতে তোলপাড় এনে দেন।
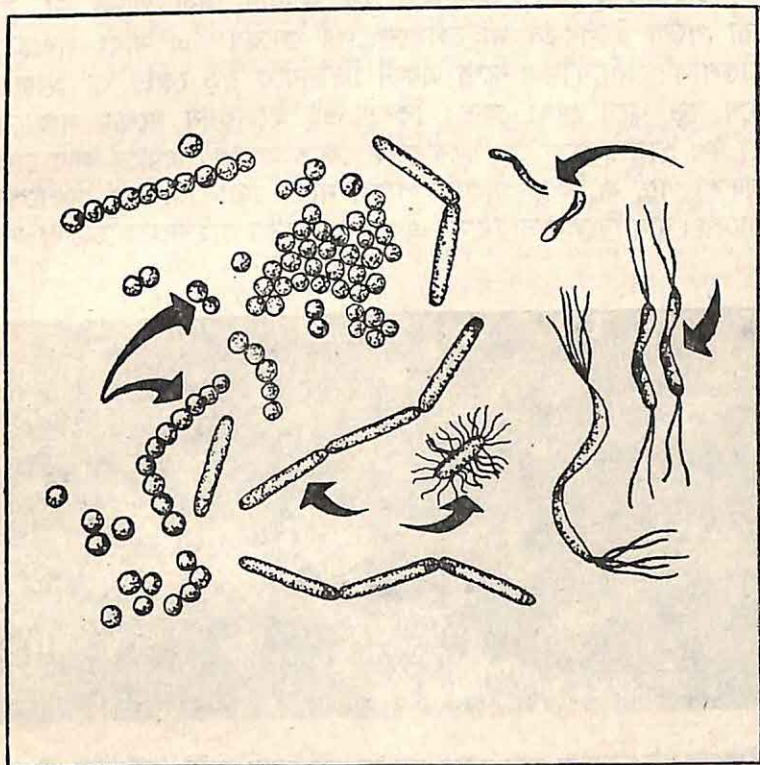
বিভিন্ন জীবাণুর ছবি। কোনও জীবাণু একা একা থাকতে ভালবাসে, কেউ থাকে জোড়ায় জোড়ায়, আবার কোনও কোনও জীবাণু একসাথে দল বেঁধে থাকে।

জীবাণুগুলি জীবন্ত আর এত ছোট যে খালি চোখে তাদের দেখাই যায় না! কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেই তাদের দেখতে পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন রকম রোগের কারণ বিভিন্ন রকম জীবাণু। পাস্তুরের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা একটা একটা করে বিভিন্ন রোগের জীবাণুগুলি খুঁজে বের করতে লাগলেন। কিন্তু কয়েকটা রোগের জীবাণু তখন খুঁজে পাওয়া গেল না। যেমন--

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা তার চেয়েও মারাত্মক রোগ—বসন্ত। বিজ্ঞানীরা বেশ বুঝতে পারলেন, জীবাণুদের মধ্যেই এমন এক একটা বিশেষ জাতের জীবাণু আছে যা অতি সূক্ষ্ম,—অণুবীক্ষণে তারা ধরা পড়ে না। কিন্তু এগুলি ভীষণ ছোঁয়াচে—যেখানে হাজির হবে সেখানেই রোগ ছড়াবে।

ভাইরাস ঃ অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে যে জীবাণু ধরা পড়ল না, তা ধরা পড়ল ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের কাছে। এ যাবৎ সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে একটা জিনিষকে বড় জোর দু' হাজার গুণ বড় করে দেখা যেত। কিন্তু এই ইলেকট্রন যন্ত্রের সাহায্যে তা দশ হাজার গুণ বড় করে দেখা যেতে লাগল। এবারে আর সেই অদৃশ্য শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারল না। বিজ্ঞানীরা ধরে ফেললেন তাদের। নাম দিলেন ভাইরাস। এক এক জাতের ভাইরাসের চেহারা এক
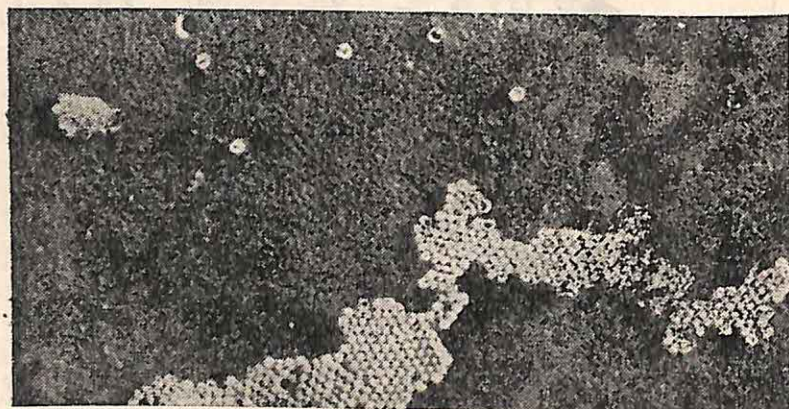
ইলেকট্রন-মাইক্রোসকোপে সত্তর হাজার গুণ বড় করে তোলা পোলিও ভাইরাসের ছবি।

এক রকম। কোনটা সুতোর মতো, কোনটা সূঁচের মতো, কোনটি গোল, কোনটি আবার চৌকো! বসন্তের ভাইরাস দেখতে ঠিক পাঁউ-রুটির মতো, ইনফ্লুয়েঞ্জার গোল। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই বাতাসে সাধারণ সর্দিকাশির ভাইরাস ছড়ায়। ফলে রোগটা ছড়িয়ে পড়ে অনেকের মধ্যে।

পেনিসিলিন নামে একটি ধন্বন্তরী ওষুধ বেরিয়েছে। এর কথা আমরা পরে বলব। এই ওষুধটি জীবাণু ধ্বংস করতে ওস্তাদ। কিন্তু ভাইরাসকে পেনিসিলিন কিছু করতে পারে না। সর্দি রোগের ঐ ভাইরাসগুলো কিন্তু রোদের তাপে সহজেই মরে যায়।

বসন্ত, কলেরা, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগের আক্রমণ থেকে টিকা নিয়ে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার তেমন কিছু প্রতিষেধক বেরোয়নি এখনও। ঠাণ্ডা লাগা থেকে যতটা সম্ভব সাবধানে থাকতে হবে এজন্য। সুকুমার রায় অবশ্য তোমাদের একটা ওষুধের কথাও বলে দিয়েছেন। যদি সম্ভব হয় পরীক্ষা করে দেখতে পারোঃ

চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো
শুকলে পরে সর্দি-কাশি থাকবে না আর কারো।

কিন্তু সব রোগই যে জীবাণু থেকে হয় তাও নয়। আগেই বলেছি, শরীরের কয়েকটি গ্রন্থি বিকল হ'লে বা ভিটামিনের অভাব ঘটলেও রোগ হতে পারে। এমনি ধারা আর একটা বেয়াড়া রোগ দেখা যায়, যার নাম দেওয়া হয়েছে এলার্জি। কারও কারও কোনও জিনিষ সহ্য হয় না। কারও ডিম খেলে মুখটা লাল চাকা-চাকা দাগে ভরে যায়, সারা গায়ে আমবাতের মত হয়ে পড়ে। কারুর বা চিংড়ি মাছ সহ্য হয় না একেবারেই। এগুলিকে বলা হয়েছে এলার্জি।

মৃত্যুর সাথে লড়াই

রোগের প্রতিকারঃ চিকিৎসা

শরীরটা 'ব্যাধিমন্দির' হলেও ব্যাধিটা কিন্তু শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। কাজেই রোগটা ধরা পড়লেই তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ চেষ্টা করে আসছে যুগে যুগে নানা ভাবে।

আদিম কালের লোকেরা প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েই রোগের চিকিৎসা করতে আরম্ভ করে। এজন্য তারা লতা-পাতা, ধাতু ও ফুল-ফলের মধ্যে, মাটি, জলের ধারা ও সূর্যরশ্মিতে রোগ প্রতিকারের পথ খুঁজে পায়। তখনকার লোকে যাদু মন্ত্রে বিশ্বাস করত। রোগ নিবৃত্তির জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাও তখন প্রচলিত ছিল। তারা ভাবত, রোগ-শোক হচ্ছে কোনও দেবতার রাগের ফল। তাই দেবতার রাগ নিবৃত্তির জন্য পুরোহিত ডেকে তারা শান্তি-স্বস্তয়ন, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির ব্যবস্থা নিত। কেউ কেউ তাবিজ, কবজ, মাদুলী প্রভৃতিও ধারণ করত।

তখন রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বিদ্যা শেখার জন্য সহজ সুযোগ ছিল না। সেইজন্য অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তিও চিকিৎসক হয়ে পড়ত। এদের বলত হাতুড়ে চিকিৎসক।

কিন্তু তাই বলে সব্বাই তখন হাতুড়ে চিকিৎসক ছিল মনে করো না যেন। গ্রীস, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ প্রাচীন কালে চিকিৎসা বিদ্যায় খুব নাম করেছিল। করলে কি হবে, তখন ত' আর এখনকার মত এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের এত সহজ যোগাযোগ ছিল না। এখন সংবাদপত্র আছে, রেডিও আছে। প্লেনে যাতায়াতের এবং দেশান্তরে গিয়ে কিছু শিখে আসবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কেউ নতুন কিছু আবিষ্কার করলে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর ছড়িয়ে পড়বে সারা সভ্য জগতে। সেইজন্য প্রাচীনকালে কেউ কিছু বড় কাজ করলে, অন্য দেশে তার খবর বেরুত অনেক দেরীতে।

প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষও চিকিৎসা বিদ্যায় এগিয়ে গিয়েছিল অনেকখানি।

প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট চিকিৎসক—সুশ্রুত। অনেক রকম চিকিৎসার কথা তিনি বলে গেছেন তাঁর বইতে। সাপের কামড়ের চিকিৎসার কথা বলতে গিয়ে তিনি কত রকমের সাপ আছে, বিষাক্ত

সাপের কোন তিথিতে কি রকম বিষ থাকে, কি ভাবে তারা কামড়ায় সব বলেছেন। চিকিৎসার কথায় তিনি বলেছেন, প্রথমেই বাঁধন দিতে হবে। তারপর কামড়ানো জায়গা চিরে, চুষে দূষিত রক্ত বের করে দেওয়ার কথা বলেছেন। আরও অনেক কথা বলেছেন তিনি এ সম্বন্ধে—যা আজকালকার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে বেশ মিলে যায়।

কেবল রোগ চিকিৎসাই নয়—শল্য চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলে গেছেন। সুশ্রুত তাঁর 'সংহিতা' বইতে অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মোহনী দিয়ে অচেতন করে তার উপর অস্ত্রোপচার করতে বলেছেন। তারপর তাকে অন্য ওষুধ দিয়ে সচেতন করে তুলবার ব্যবস্থাও আছে। সুশ্রুত অর্শ, ভগন্দর, পাথরী, ক্যাটারাক্ট, হার্নিয়া প্রভৃতি রোগে অস্ত্র ব্যবহারের কথা বলেছেন। তখনকার দিনে অস্ত্রোপচারে প্রায় একশো পঁচিশ রকম ছুরি কাঁচি প্রভৃতি ব্যবহৃত হ'ত। তিনি বলেছেন, অস্ত্রোপচার কালে চিকিৎসকের সহযোগী থাকবে। অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীকে উপবাসী রাখতে হবে।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা—সূর্যকিরণ

সূর্যই হচ্ছে সমস্ত শক্তির মূলাধার। পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই সূর্য। এই মহাদ্যুতি সূর্য যে সমস্ত রোগরূপ পাপকে বিনাশ করেন তা ভারতীয় ঋষিরা জানতে পেরেছিলেন। তাই আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে সূর্য পূজা চলে আসছে।

তোমরা যদি কেউ পুরী গিয়ে থাক তাহলে নিশ্চয়ই সেখান থেকে কোণারকের সূর্য মন্দির দেখে এসেছ। এটি তৈরি হয়েছিল খৃষ্ট জন্মের প্রায় দু' হাজার বছর আগে। এই মন্দিরের বিগ্রহ সূর্য ছিল সোনা দিয়ে তৈরি। না, গালগল্প নয়—চীন পরিব্রাজক ইয়াং চিয়াং তাঁর বইতে সোনা দিয়ে তৈরি সূর্যদেবের এই বিরাট বিগ্রহের কথা লিখে গেছেন। তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছেন।

এই মন্দিরটি তৈরির ইতিহাস পুরাণের শাম্ব উপাখ্যানে লেখা আছে। শাম্ব ক্ষয়িষ্ণু ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁর স্নায়ু সকল কৃশ হ'য়ে পড়ল, বাঁচবার আশা থাকল না। তখন এই সূর্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শাম্ব প্রত্যহ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কালে উন্মুক্ত সূর্যরশ্মিতে দাঁড়িয়ে সূর্যের স্তবপাঠ করতে লাগলেন। তাতেই তিনি কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন।

সূর্যকিরণের যে দুরারোগ্য ব্যাধিও নিরাময় করবার ক্ষমতা আছে—একথা ভারতবাসীরা অনেক আগেই জানতেন।

কেবল ভারতবাসীই নয়—অন্যান্য সভ্যদেশের লোকেরাও সূর্যকিরণের মহিমা বুঝতে পেরেছিল। ঈজিপ্টবাসীরা খৃষ্টজন্মের প্রায় বারোশ' বছর আগে সূর্যপূজা করত। পারস্যের লোকেরা করত খৃষ্টজন্মের ছ'শো বছর আগে। খৃষ্টজন্মের প্রায় চারশো বছর আগে গ্রীসের লোকেরা সূর্য-কিরণ দিয়ে যে রোগ সারানো যেতে পারে একথা বুঝতে পেরেছিল। হীপোক্রেটস নামে একজন গ্রীক চিকিৎসক সূর্যকিরণ দিয়ে নানারকম জটিল রোগ সারিয়ে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু কেন সূর্যকিরণে রোগ সারে? সূর্যকিরণের মধ্যে কি আছে? বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, সূর্যকিরণে যে সাতরঙা আলো দেখতে পাওয়া যায়, তা ছাড়াও ওতে আরও আলো আছে। চোখে অবশ্য তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। এদের নাম দেওয়া হয়েছে—ইন্‌ফ্রারেড রে ও আলট্রাভায়োলেট রে। রবীন্দ্রনাথ এদের বাংলা নাম

দিয়েছেন লাল উজানী আলো এবং বেগনী পারের আলো। বেগনী পারের আলোর রোগ সারানোর ক্ষমতা অদ্ভুত। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি, দেহের গঠন ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য এটার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে আলট্রাভায়োলেট রে ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে এখনও মায়েরা কচি শিশুদের সরষের তেল মাখিয়ে রৌদ্রে রাখেন। কৃষকেরা মাঠে রৌদ্র ভোগ করে বলেই অনেক সময় তাদের শরীর ভালো থাকে।

রোদের মত জলমাটিও অনেক রোগ সারাতে পারে। গায়ে পলি-মাটি মাখলে খোস-পাঁচড়া, চুলকানির উপশম হয়। বেশি জ্বর উঠলে মাথায় জলের ধারা দিলে জ্বর কমে। মাথা ধরলেও কপালে জলপটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গাছপালাও প্রাকৃতিক সম্পদ। অনেক রোগ চিকিৎসায় এর ব্যবহার দেখা যায়।

নানারকম ওষুধ আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসকও হ'ল অনেক রকমের—কবিরাজী, হেকিমী, হোমিওপ্যাথ, এ্যালোপাথ—এইসব। নানারকমের চিকিৎসা পদ্ধতির ফলে চিকিৎসা বিভ্রাটও যে না ঘটে এমন নয়। তোমার কান কামড়াচ্ছে—পাঁচজনকে বল। দেখবে পাঁচজন তোমাকে পাঁচ রকমের ওষুধ বাৎলে দেবে!

আমরা কোন্ রকমের চিকিৎসা মেনে নেব ? এটা বিজ্ঞানের যুগ। কাজেই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাই আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। যিনি বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করেন এবং অভিজ্ঞ, তাঁরই পরামর্শ নিতে হবে আমাদের। 'বিজ্ঞানসম্মত' কথাটি একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। সাপে কামড়ালে ধুলো পড়ার বাঁধন দেওয়ার চাইতে দড়ির বাঁধন বিজ্ঞানসম্মত। মন্তর পড়ে বিষ নামানোর চেয়ে ক্ষতস্থান চিরে এবং 'সাক্' করে বিষ তুলে ফেলা বিজ্ঞানসম্মত। অস্ত্রোপচার করবার আগে ঐ স্থানে মৃদু কার্বলিক এ্যাসিডের মতো রোগজীবাণু নাশক ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডিজ করে নেওয়া বিজ্ঞানসম্মত। খ্যাপা কুকুরে কামড়ালে 'মালসা চালান' দিয়ে বিষ নামানোর চেয়ে জলাতঙ্ক রোগের ইনজেক্-সন্ দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত।

যা রোগের প্রতিষেধক তা' বাদ দেওয়া চলে না। চিরতা, কালমেঘ, অর্জুন বৃক্ষের ছাল, শ্বেতপুর্ণিমা বা পুনর্নবা শাক, বাসকের পাতা এবং আরও কত উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন রোগের অব্যর্থ ওষুধ পাওয়া যায়। কিন্তু সব সময় এগুলি যোগাড় করা যায় না—সহরে যোগাড় করা ত' আরও মুস্কিল। তাই এইসব দরকারী গাছের পাতা বা ছালের নির্যাস নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ওষুধ তৈরি হচ্ছে। কেবল গাছ-

পালাই নয়—ঢেঁকিছাঁটা চালের কুঁড়োয় থাকে ভিটামিন ‘বি’। পাড়া-গাঁয়ের চাষীরা এই ভিটামিন যথেষ্ট পায়। যারা পায় না, তাদের জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওটা তৈরি হয়। এইভাবে অন্যান্য ভিটামিনও বিজ্ঞানীরা তৈরি করছেন।

আদিম কালের মানুষেরা জানত, দিনের পর রাত্তির হয়, শীতের পর আসে গ্রীষ্ম। এটা যেমন নিশ্চিত, তেমনি মানব শরীরে ব্যাধির আক্রমণও নিশ্চিত। কিন্তু কেন এসব হয় তা তারা জানত না। যাঁরা চিন্তাশীল—তাঁরা যুগে যুগে এই ‘কেন’র উত্তরই খুঁজে বেড়িয়েছেন। ব্যাধির ব্যাপারেও কি, কেন এবং তার নিরাময়ের উপায় কি, এইগুলি হ’ল বড় প্রশ্ন। দুঃখ-কষ্ট, ভুলভ্রান্তি, উপহাস এবং ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে এই প্রশ্নগুলির সমাধানের অক্লান্ত সাধনা করেছেন চিন্তাশীল মনীষীরা। তাঁদের আত্মত্যাগ ও সাধনার ফলেই আজ আমরা অনেক ক্ষেত্রে রোগ-যন্ত্রণা ও ব্যাধির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি।

রক্তচলার পথঃ বাঁ দিকে বুকের উপর হাত রাখলে বুঝতে পারবে, কি একটা জিনিষ বুকের ভিতর সব সময় ধুক্ ধুক্ করছে। এটাই হৃদ্‌পিন্ড বা হার্ট। এটি দেখতে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, আড়াই ইঞ্চি চওড়া এবং আড়াই ইঞ্চি পুরু একটা পেশীময় থলের মতো। নিজের হাত মুঠো করলে যত বড় হয় প্রত্যেক লোকের হৃদ্‌পিন্ড আকারে তত বড়। এই যন্ত্রটি মাতৃগর্ভ থেকে মানবদেহের মৃত্যু পর্যন্ত কখনও স্থির থাকে না, সব সময়েই পাম্প করে রক্তস্রোতকে ঠেলে দিচ্ছে ধমনীগুলির

উইলিয়াম হার্ভে তাঁর রক্ত চলাচলের থিয়োরী পরীক্ষা করে দেখাচ্ছেন।

মধ্যে। হৃদ্‌পিণ্ডের চাপে রক্ত ফুসফুসের ভিতর দিয়ে ঘুরে আসে। আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু ফুসফুসের মধ্যে নিই, তা' ওই রক্তকে শোধন করে দেয়। এই শোধিত রক্ত আবার ধমনীর ভিতর দিয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রক্তপ্রবাহ যে পরিমাণ শক্তিকে ঠেলা দিয়ে এগিয়ে যায় তারই নাম রক্তের চাপ (ব্লাড প্রেসার)। আমাদের দেশে রক্তের স্বাভাবিক চাপ—বয়সকে দু' ভাগ করে তার সঙ্গে একশো যোগ করলে যত হয় তত মিলিমিটার।
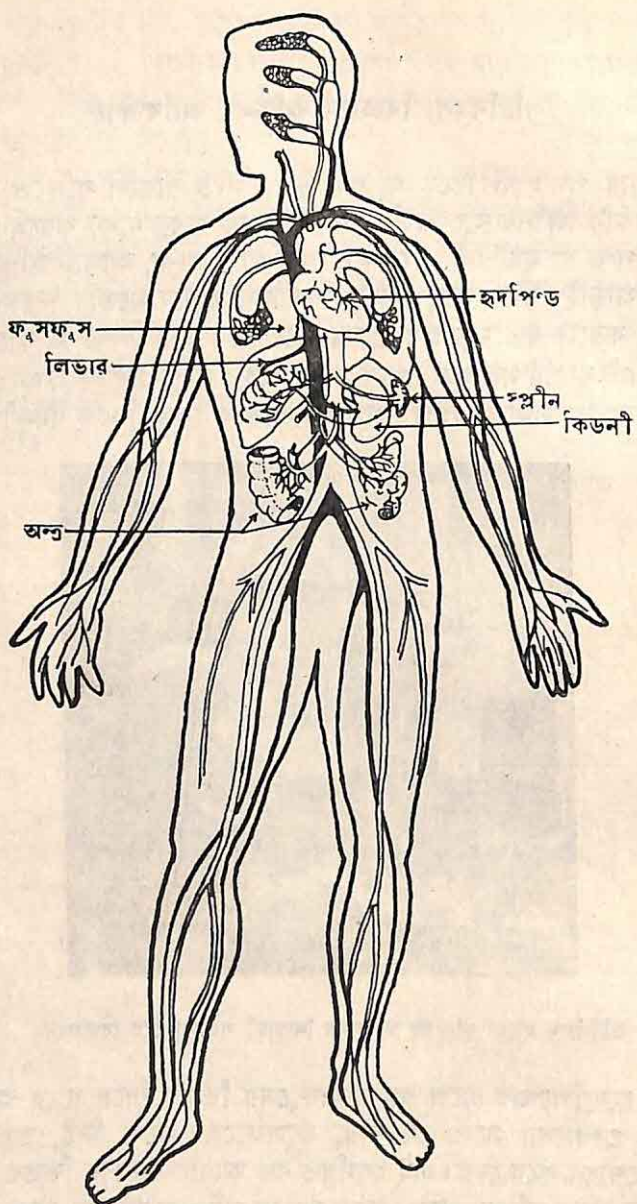
মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন ; রক্ত কেবল একদিকেই প্রবাহিত হয় আর হৃদ্‌পিণ্ড পাম্প করে রক্তকে বৃত্তাকার পথে চালিত করে।

অনেক দিন ধরে শারীর-বিজ্ঞানীরা বলে আসছিলেন যে, জীব-দেহের রক্ত-তৈরি হয় যকৃৎ থেকে। এক ধরনের রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের ডান দিক থেকে এসে অসংখ্য শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। আর এক ধরনের রক্ত আসে হৃদ্‌পিণ্ডের বাঁ দিক থেকে এবং ধমনী, উপধমনীর ভিতর দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হার্ভে নামে এক বিজ্ঞানী প্রমাণ করলেন, রক্ত কেবল এক দিকেই প্রবাহিত হয়। শিরা, উপশিরা দিয়ে রক্ত কেবল হৃদ্‌পিণ্ডের দিকেই যেতে পারে। হৃদ্‌পিণ্ডের ডানদিক থেকে রক্তপ্রবাহ সারা শরীরে যায় না।

তিনি আরও বললেন—রক্ত দু'রকম নয়। একই রকম রক্তকে হৃদ্‌পিণ্ড পাম্প করে তার বৃত্তাকার পথে চালিত করছে। ধমনী-গুলির নিজেদের ধুক্‌ধুক্‌ করবার ক্ষমতা নেই। হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্‌ধুকানির জন্যই নাড়ীর ধুক্‌ধুকানি।

আজকের অস্ত্র চিকিৎসক প্লাসটিকের কৃত্রিম নলের সাহায্যে রক্তকে চালিত করছেন, মুমূর্ষু রোগীর দেহে অপরের হৃদ্‌পিণ্ড সংযুক্ত করে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অব্যাহত রাখছেন, কিন্তু প্রায় তিনশো বছর আগে জীবদেহের রক্ত সঞ্চালন প্রণালী সম্বন্ধে হার্ভে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তার উপর নির্ভর করেই এগিয়ে এসেছে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান এতখানি!

ম্যালেরিয়াঃ গোড়ার দিকে রোগ ছিল, কিন্তু প্রতিকার ছিল না। খুব কাঁপিয়ে জ্বর আসত মানুষের, পিপাসা হত, তারপর হাত-পা অবশ হয়ে মারা যেত। একজন, দু'জন নয়—হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ এইভাবে মারা যেত। আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় কত সমৃদ্ধ জনপথ এই জ্বরে ধ্বংস হয়ে গেছে। বাংলার পল্লীকে একদিন শ্মশান করেছে এই জ্বরে।

কি এই জ্বরের নাম, কেনই বা এই জ্বর হয়—কেউ তা জানত না। তবে লোকে লক্ষ্য করল, ভাপসা জলার আশেপাশে এই রোগের প্রকোপটা খুব বেশি। তাই তারা মনে করল, দূষিত (mal) বায়ুর (air) জন্যই এই জ্বর হয়। একজন ইটালিয়ান সেইজন্য এই জ্বরের নাম দিলেন—mal air. তার থেকেই আমরা 'ম্যালেরিয়া' নামটি পেলাম।

এই জ্বরের ওষুধও পাওয়া গেল আকস্মিকভাবে। লিমা দেশের কয়েকজন লোক দেখল, কোনও জায়গার জল খাওয়ালে এই জ্বর আস্তে আস্তে কমে আসে। কি আছে এই জলে, যার জন্য জলের আস্বাদটা হয় তেতো এবং এই জলে জ্বর সারে? তারা দেখল, 'কিনা'

(Quina) বলে একরকম গাছের ডালপালা পড়েছিল সেখানকার জলের মধ্যে। এই গাছের ছালের রস ভীষণ তেতো। তখন থেকে তারা কারও জ্বর হলে এই গাছের ছাল সিদ্ধ করে তাকে খাওয়াতো।

স্পেন দেশের ভাইসরয়ের স্ত্রীর নাম ছিল—কাউণ্টেস অব সিনকন। তাঁর একবার এই জ্বর হয়। স্থানীয় চিকিৎসকেরা ঐ 'কিনা' গাছের ছাল সিদ্ধ করে তাঁকে খাওয়ায়। জ্বর সেরে যায়। সিনকন সেরে উঠে ম্যালেরিয়ার যম এই অব্যর্থ ওষুধটি সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তখনকার উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ লিনিয়স সাহেব সিনকনের গৌরবে এই গাছের নাম দেন—সিনকোনা। এটা প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগের কথা।

যখন জানা গেল, সিনকোনার ছালে ম্যালেরিয়া সারে, তখন থেকেই এই গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকায় এই গাছ আনতে লোকে ছুটল। নানা দেশের ব্যবসায়ীরা নৌকা ভর্তি করে এই গাছের ছাল আমদানি করতে লাগল। অন্যান্য দেশেও এই গাছের আবাদ আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু দেড়শো বছর আগেও সিনকোনার ছালে ম্যালেরিয়া রোগ কেন সারে তা কেউ বলতে পারত না। ১৮২০ সালে দু'জন রসায়নবিদ্ প্যারিসের এক রসায়নাগারে সিনকোনা গাছের ছাল থেকে জ্বর নিবারণের যে বস্তুটি (উপক্ষার—alkaloid) আবিষ্কার করলেন, গাছের আদি নাম 'কিনা' (quina) থেকে তার নাম হল কুইনিন। রোগটির চিকিৎসা পাওয়া গেল, কিন্তু ম্যালেরিয়া কেন হয়, কি করেই বা তা সংক্রামিত হয় তা জানা গেল না। যাবেই বা কি করে ?—সে যে অতি ক্ষুদ্র, অদৃশ্য শত্রু! খালি চোখে তাদের দেখবার উপায় নেই। কিন্তু তবু লোকে অনুমান করেছিল, ভাপসা জলা জায়গার আশপাশে একরকম অদৃশ্য ক্ষুদ্র জীব তাদের ডিম ছাড়ে। তার বাচ্চা হয়। তাদের খালি চোখে দেখা যায় না। তার থেকেই ছড়িয়ে পড়ে এই রোগ।

অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ঃ হল্যাণ্ডে লিউএন হুক নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি শুনেছিলেন, খুব পরিষ্কার কাঁচখণ্ড ক্রমাগত ঘষবার ফলে এমন একটা শক্তি লাভ করে, যাতে তার ভিতর দিয়ে তাকালে খুব ছোট জিনিষকে বড় করে দেখায়। তিনি তারপর থেকে কাঁচ ঘষে ঘষে নানাধরনের লেন্স তৈরি করতে লেগে গেলেন। একদিন একটা নোংরা বদ্ধ জলার থেকে এক ফোঁটা জল নিয়ে তিনি তাঁর ঐ ঘষা কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন—আশ্চর্য ব্যাপার! ঐ এক ফোঁটা জলের মধ্যে কত সব ছোট ছোট জন্তু! তারা সাঁতরাচ্ছে, খেলা করছে, মারামারি করছে। তাদের কেউ লম্বা, কেউ গোল আবার কেউ বা চৌকো! লম্বা

কাঠির মতো যাদের চেহারা তাদের নাম দেওয়া হ'ল 'ব্যাকটেরিয়া'। গ্রীক ভাষায় কাঠিকে বলে—ব্যাকট্রোণ। তার থেকেই এই নাম।
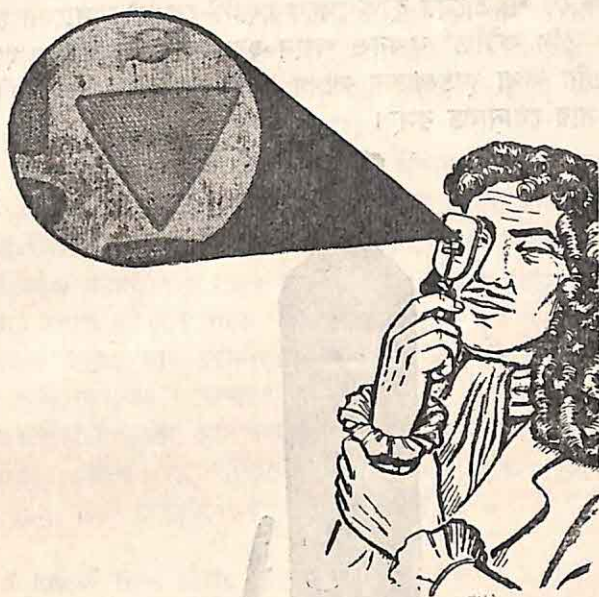
হুক তাঁর তৈরি এক ধরনের মাইক্রোসকোপ দিয়ে রোগ জীবাণুকে বড় করে দেখছেন।

এইসব ক্ষুদে জানোয়ারই হচ্ছে আমাদের আসল যম। বেশির ভাগ রোগই হয় আমাদের এদের জন্যে। একথা অবশ্য আবিষ্কার হয়েছিল অনেক পরে। যাঁরা তা আবিষ্কার করেন তাঁদের মধ্যে অবশ্য দুজনের নাম করতেই হবে। তাঁদের একজন—লুই পাস্তুর। আর একজন রবার্ট কখ্।

হাঁ, কথা হচ্ছিল ম্যালেরিয়ার জীবাণু নিয়ে। খালি চোখে এদের দেখা যেত না, কিন্তু অণুবীক্ষণ আবিষ্কার হওয়ার পর এরা আর গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারল না।

বিভিন্ন দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায়, বড় বড় বীরেরা বিকটাকার রাক্ষস, অতি হিংস্র ড্রাগন প্রভৃতিকে হত্যা করে কীর্তিমান হয়েছেন। কত মানুষ মেরেছে এইসব রাক্ষস আর ড্রাগনেরা ?—দু'শো, পাঁচশো, হাজার ! কিন্তু এই ম্যালেরিয়ার জীবাণু—এরা-মেরেছে চোরা গুপ্তি মার,—লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ-সংহার করেছে এরা। তাছাড়া

রাক্ষস বা ড্রাগন—কত বড়, কোথায় থাকে সবই জানা যায়। কিন্তু ম্যালেরিয়ার জীবাণুর হদিশ পাওয়া যায়নি বহুকাল। জানা যায়নি তার আকৃতি-প্রকৃতি বা বাসস্থান। সেইজন্য আমরা বলব, যিনি এই অদৃশ্য ক্ষুদে শয়তানের হাত থেকে কোটি কোটি মানুষের প্রাণরক্ষা করলেন—তাঁর কীর্তি কখনও ম্লান হবে না। যুগ যুগ ধরে সভ্য মানুষ তাঁর কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। এই কীর্তিমান হচ্ছেন—স্যর রোনাল্ড রস্।
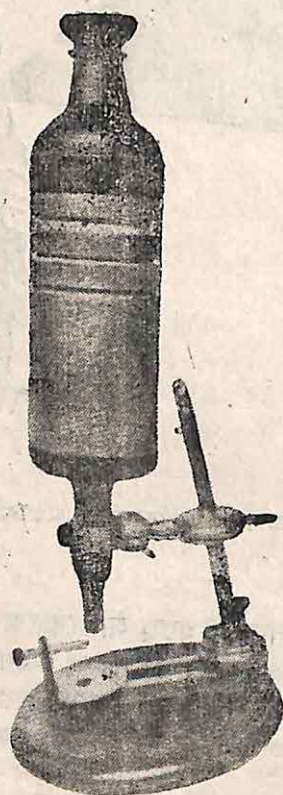
হুক মাইক্রোসকোপ। এখন বিজ্ঞানীরা যে ধরনের উন্নততর মাইক্রোসকোপ ব্যবহার করেন তার সাথে লিউয়েন হুকের তৈরি মাইক্রোসকোপের চেহারার যথেষ্ট মিল আছে।

ল্যাভেরান নামে একজন ফরাসী ডাক্তার প্রচার করেন যে, মশাতেই ম্যালেরিয়া ছড়ায় ; কিন্তু তাঁর কথায় কেউ বড় একটা গুরুত্ব দেয়নি।

স্কটল্যাণ্ডবাসী মেজর রোনাল্ড রস্ এই সময়ে ভারতে মেডিক্যাল

সারভিসে আসেন। তিনি ল্যাভেরানের কথার সত্যতা জানবার জন্য মশাকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগে যান।

কতকগুলি লোককে মশারি না দিয়ে কয়েকদিন ধরে তাদের মশার কামড় খাওয়ানো হল। তারপর তাদের রক্ত পরীক্ষা করে ডাঃ রস কোনও ম্যালেরিয়ার জীবাণু পেলেন না। এইভাবে দিনের পর দিন চলল তার পরীক্ষা। কেবল ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তই নয়—মশার দেহকেও খণ্ড খণ্ড করে পরীক্ষা চলল।

অবশেষে রস আবিষ্কার করলেন, সব মশার কামড়েই ম্যালেরিয়া হয় না। এনোফিলিস নামে একরকম মশকীর কামড়েই ম্যালেরিয়া হয়। এরা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়িয়ে তার রক্ত নেয়। আবার সেই রক্ত অন্য লোককে কামড়াবার সময় তার দেহে ঢুকিয়ে দেয়। এইভাবেই ম্যালেরিয়া রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

১৯০২ সালে স্যর রোনাল্ড রস্ তাঁর এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

কলকাতার পি. জি. হাসপাতালের (এখনকার এস. এস. কে. এম. হাসপাতাল) একটা নীচু পাঁচিলের ফটকের মাথায় রস্ নিজে একটি কবিতা রচনা করে গেছেন। তার শেষাংশ এইঃ

I know this little thing—
A myriad men will save,
O Death, where is thy sting?
Thy victory, O Grave?

অর্থাৎ—আমি জানি, ছোট্ট এই আবিষ্কার বাঁচাবে অগণিত মানুষের প্রাণ। ওগো মৃত্যু, আর তুমি কি করতে পারবে? শ্মশান, তুমি জয় করবে কাকে?

রোগ-জীবাণুঃ ফরাসী দেশের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক লুই পাস্তুরের নাম কে না জানে? অণুবীক্ষণ সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করেন, রোগের জীবাণু আছে এবং রোগকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে জীবাণুরাই ছড়িয়ে দেয়। জীবাণু আসে বায়ু থেকে ধুলোর সঙ্গে। ধুলো হচ্ছে জীবাণুর বাহন আর বায়ু হচ্ছে ধুলোর বাহন।

ফরাসী দেশে একবার রেশম কীটের মড়ক লেগেছিল। পাস্তুর পরীক্ষা করে দেখলেন, খুব ছোট একরকম রোগ জীবাণু ঐ সব রেশম কীটের গায়ে লেগে রয়েছে। এদের প্যারাসাইট বলা হয়। প্যারাসাইটগুলি নষ্ট করে দিয়ে পাস্তুর তাঁর দেশের রেশম শিল্পকে রক্ষা করেন।

আর একবার দেশের পশুমহলে মড়ক লাগল। গরু-ভেড়া-ছাগল একধার থেকে মরতে আরম্ভ করল। এবারও পাস্তুরের ডাক পড়ল। তিনি দেখলেন, রোগগ্রস্ত জীবের কাছ থেকে একরকম জীবাণু সুস্থ প্রাণীর দেহেও সংক্রামিত হয়। এই জীবাণুগুলিকে দুর্বল করে দেওয়ার কৌশল পাস্তুর আবিষ্কার করলেন। তারপর তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, এই দুর্বল রোগজীবাণু যদি সুস্থ প্রাণীর দেহে ঢুকানো (ইনোকুলেট) যায়, তাহলে সুস্থ প্রাণীগুলি রক্ষা পেতে পারে।

লোকে তাঁর কথা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি। রোগ-জীবাণু শরীরে ঢুকিয়ে আবার সেই শরীরকেই রোগের হাত থেকে রক্ষা করা—এ আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করবেই বা কে!

কিন্তু পাস্তুর প্রমাণ করে দিলেন, তা সম্ভব। তিনি কতকগুলি মেষের শরীরে দুর্বল রোগ-জীবাণু ঢুকিয়ে এবং কতকগুলির শরীরে
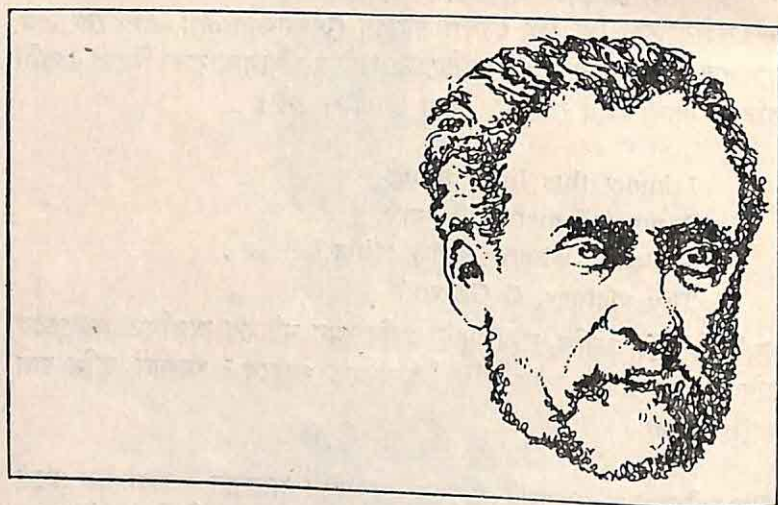
লুই পাস্তুর
জন্ম: ১৮২২, মৃত্যু: ১৮৯৫ ; ফরাসী জীববিজ্ঞানী পাস্তুর সর্বপ্রথম জীবাণু আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতে তোলপাড় এনে দেন।

তা না ঢুকিয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিলেন যে, যেগুলির শরীরে জীবাণু ঢুকানো হয়েছিল তারা বেঁচে গেল—আর যাদের শরীরে ঢুকানো হয়নি, তাদের প্রত্যেকটি গেল মরে!

জলাতঙ্ক রোগ: আগের দিনে ক্ষ্যাপা শিয়াল কুকুরে কামড়ালে তার কোন চিকিৎসা ছিল না—সকলেই মরে যেত। কাঠোর পরিশ্রম আর

ধৈর্য নিয়ে পাস্তুর আবিষ্কার করলেন,—এক রকম জীবাণুর দ্বারা ঐ রোগ হয়। তিনি ঐ জীবাণু ধ্বংসের ওষুধ তৈরি করলেন। একটা পাগলা কুকুর যদি আর একটা সুস্থ কুকুরকে কামড়ায়, তাকে ঐ 'ভ্যাকসিন' দিলে সে আর ক্ষ্যাপে না।

কিন্তু মানুষের বেলায় কি হবে? পাস্তুর সাহস পাচ্ছিলেন না—মানুষের উপর এর পরীক্ষা চালাতে। অবশেষে তিনি স্থির করলেন, নিজের উপরই তিনি এই পরীক্ষা করে দেখবেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন— I have a good mind to begin on myself. অর্থাৎ অগত্যা নিজের উপরই এই পরীক্ষা চালিয়ে আমি দেখব।

কিন্তু এ ভাবে দেখবার প্রয়োজন হয়নি তাঁর। কয়েকদিন পরেই এক মা তার পাগলা কুকুরে কামড়ানো সন্তানকে নিয়ে উপস্থিত তাঁর কাছে। ছেলেটির বয়স মাত্র ন-বছর। দুদিন আগে তাকে একটা ক্ষ্যাপা কুকুরে দেহের চৌদ্দ জায়গায় কামড়িয়ে দিয়েছে, সে হাঁটতে পারছে না—তার জামায় রক্ত আর কুকুরের লালা জড়িয়ে আছে। ছেলেটি ভয় পেয়ে গিয়েছে খুব। তার মা পাস্তুরের পা জড়িয়ে ধরে বলল,—আমার একমাত্র ছেলে, ওকে বাঁচান।

কি করবেন পাস্তুর? চিন্তা করবার সময় কোথায়? তিনি দেখলেন, ছেলেটির মৃত্যু অবধারিত। তাঁর ওষুধ দিয়ে তাকে বাঁচান যায় নাকি? কেন যাবে না? যদি পশুর উপর ওষুধের কাজ হয় তাহলে মানুষের উপরই বা কেন হবে না? তিনি পর পর কয়েকটা ইনজেকসন দিয়ে দিলেন তাকে। কিছুদিন পরেই সে সুস্থ হয়ে গেল। পাস্তুরের জয়-জয়কার পড়ে গেল চারদিকে।

তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে জগতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক আজও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আসছে।

বসন্তের টিকাঃ পাস্তুর তাঁর 'ভ্যাকসিন' তৈরি করে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু এই ওষুধ আবিষ্কারের মতলবটা পেয়েছিলেন তিনি এডওয়ার্ড জেনারের কাছে। তিনি ইংল্যাণ্ডের লোক। ইংল্যাণ্ডে তখন প্রায়ই বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দিত। জেনার লক্ষ্য করলেন, যাদের জল-বসন্ত হয় তাদের খাঁটি বসন্ত (স্মলপক্স) হয় না। আবার কারও খাঁটি বসন্ত হলে পরে আর তার সাংঘাতিক বসন্ত হয় না কোনদিন। জেনার গরুর গায়ের বসন্ত থেকে বীজ নিয়ে মানুষের গায়ে দিয়ে টিকার প্রচলন করেন। আজ সারা বিশ্বের লোক তাঁর এই আবিষ্কারে ধন্য হয়েছে।

আমরা সবাই টিকা নিই, কিন্তু দেখা যায় কারো টিকা উঠেছে

কারও ওঠেনি। কোন্‌টা ভালো ? দুই-ই ভালো। টিকে নেওয়া মানে ঐ রোগেরই খুব সামান্য সূক্ষ্মতম অংশ যদি আগেভাগেই কারো শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে শরীরের মধ্যেই তার কতকগুলি প্রতিষেধক তৈরি হতে থাকে—বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন—'এ্যান্টিবডি'। শরীরের মধ্যে এই এ্যান্টিবডি বা প্রতিষেধক একবার তৈরি হয়ে গেলে রোগটা যদি পরে কখনও প্রবলভাবে আক্রমণ করতে আসে, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা দেখা যাবে, শরীরের মধ্যে আগেই তৈরি হয়ে আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি কার্টুনে ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনারকে রোগীর দেহে বসন্তের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন দিতে দেখা যাচ্ছে। এখানে কার্টুনিস্ট ছবির ভয় পাওয়া লোকগুলির চিত্র তুলে ধরেছেন।

কারও টিকা না উঠলে বুঝতে হবে, প্রতিষেধক তার দেহের ভিতরেই আছে। আবার উঠলে বুঝতে হবে, দেহে প্রতিষেধক ছিল না, এইবার তারা ঢুকল। টিকা নেওয়াটাই বড় কথা। উঠা না-উঠা বড় কথা বা চিন্তার কথা নয়।

ডিপথেরিয়া ও কলেরাঃ প্রায় একশো বছর আগে সারা ইউরোপের বুকে ডিপথেরিয়া রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। শিশুদেরই এই রোগ হয় বেশি। ডাক্তার লোফলার এই রোগের জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে

গিয়ে আবিষ্কার করলেন,—'ক্লেব' বলে একরকম জীবাণুই ডিপথেরিয়ার কারণ। তিনি পরীক্ষা করে আরও দেখলেন, এ রোগ একটা গণ্ডীর মধ্যে থাকে—সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে না। এর জীবাণু হৃদ্‌যন্ত্রকে নষ্ট করে দেয়।

এই সময়ে এমিল বেরিং নামে আর এক বিজ্ঞানী নানারকম পরীক্ষার পর আবিষ্কার করলেন—আয়োডিন ট্রাই ক্লোরাইডে এই রোগ ভালো হয়।

অ্যাণ্টিবডির কথা আগেই বলেছি। ডিপথেরিয়া রোগে শরীরে এই অ্যাণ্টিবডি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর সিরাম তৈরি করবার জন্যে ঘোড়ার রক্তের মধ্যে দফায় দফায় এই রোগের বীজ ঢুকানো হয়। ফলে তার রক্তের মধ্যে ডিপথেরিয়া এ্যাণ্টিবডির পরিমাণ যায় খুব বেড়ে। রোগীর দেহে ওটা ইন্‌জেকসন করলে আসল বীজাণুর হয় বিনাশ। ফলে রোগী বেঁচে যায়।

রবার্ট কখ্ (১৮৪৩-১৯১০)—যক্ষ্মা জীবাণুর আবিষ্কারক। এই অসাধারণ জার্মান ডাক্তার গত শতাব্দীর শেষ দিকে লুই পাস্তুরের সঙ্গে জীবাণু বিদ্যা বিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কলেরা যখন মহামারী রূপে দেখা দেয় তখন সে হয় এক ভয়াবহ অবস্থা। অনেকে বাড়ীঘর ছেড়ে পালায়। গ্রাম শ্মশান হয়ে পড়ে।

জার্মান ডাক্তার রবার্ট কখ্ কলেরার প্রতিষেধক কিছু আবিষ্কার করবার জন্যে নানারকম জীবাণু ঘাটছিলেন। জীবাণু থেকেই যে ব্যাধির উৎপত্তি একথা তখন কেউ জানত না ; বিশ্বাসও করতে চাইত

না। কিন্তু কখ্ মনে করেন, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি যত রকমের ব্যারাম দেখা যায়—তার প্রত্যেকটি সৃষ্টি করে বিভিন্ন রকম জীবাণুতে। তিনি কলেরা রোগে একটা নতুন ধরনের জীবাণু দেখতে পেলেন। এগুলি দেখতে অনেকটা 'কমা'র মতো। এ সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি ভারতে এলেন। কলকাতার মেডিকেল কলেজে তিনি 'কমা জীবাণু' নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন। তিনি দেখলেন, এই ধরনের জীবাণু অন্য কোনও রোগের মধ্যে পাওয়া যায় না। কখ্ ঘোষণা করলেন, কমা জীবাণু পেটে না গেলে কখনও কলেরা হতে পারে না। জলের মাধ্যমেই এই রোগ পেটে ঢোকে।

এরপর প্যারিসের ডাক্তার কোলে আবিষ্কার করলেন, কলেরার টিকা।

কখ্ যক্ষ্মা রোগের জীবাণুও আবিষ্কার করেছিলেন। সেইজন্য যক্ষ্মা রোগকে—Koch's disease বা কখ্ রোগও কেউ কেউ বলেন।

কালাজ্বর: কালাজ্বরের রোগীর চেহারা দেখলেই আঁতকে উঠতে হয়। হাত-পা হয়ে যায় সরু সরু, পেটটি অসম্ভব মোটা আর গায়ের রং হয় কালো। একদিন আসাম ও বাংলাদেশকে এই কালাজ্বর ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। এই ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করলেন একজন বাঙালী ডাক্তার—ইউ. এন. ব্রহ্মচারী।

ডাঃ ব্রহ্মচারী যখন ক্যাম্বেল হাসপাতালের ডাক্তার তখন তিনি দেখতেন, দলে দলে কালাজ্বরের রোগী আসছে। হাসপাতাল থেকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, অথচ ফল হচ্ছে না। রোগীরা কত আশা করে আসে তাঁদের কাছে, কিন্তু তাঁরা অক্ষম, কিছুই করতে পারেন না তাঁরা। শত শত মায়ের চোখের জল ডাঃ ব্রহ্মচারীকে ব্যাকুল করে তুলল।

এই সর্বনাশা রোগের ওষুধ কি? দিনরাত ভাবতে লাগলেন ডাঃ ব্রহ্মচারী। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলল। অবশেষে তিনি ইউরিয়া দিয়ে তৈরি করলেন—স্টিবানিক এ্যাসিড। এটা একটা নতুন ওষুধ। এর নাম দিলেন তিনি ইউরিয়া স্টিবামিন। এই ওষুধে কালাজ্বরের রোগী আশ্চর্য ভাবে সেরে উঠতে লাগল। দেশ-বিদেশে ডাঃ ব্রহ্মচারীর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

থারমোমিটার ও স্টেথোস্কোপ: অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে রোগ-জীবাণুকে ধরতে পারা গেছে। এটা আবিষ্কৃত না হলে আরও বহুকাল আমাদের কলেরা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে ভুগতে হত।

থার্মোমিটার আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসাটা অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। ব্যাধির প্রকোপটা জ্বরে জানিয়ে দেয়। আবার জ্বর কতখানি উঠল নামল তা জানিয়ে দেয় থার্মোমিটার। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্সের ফারেন হাইট পারদযুক্ত থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন।

চিমটি আর কমণ্ডলু যেমন সাধু-সন্ন্যাসীর পরিচয়, স্টেথোস্কোপও তেমনি ডাক্তারকে চিনিয়ে দেয়। চোঙের মতো এই যন্ত্রটিকে ডাক্তারেরা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ান।

এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেন ফরাসী দেশের এক ডাক্তার। তাঁর নাম লেন্নে। তিনি একদিন দেখলেন, ছেলেরা খেলা করবার সময়—কাঠের একপ্রান্তে একজন কান পেতেছে আর অপর প্রান্তে আর একজন কাঠের উপর টোকা মেরে খবর পাঠাচ্ছে। লেন্নে ভেবে দেখলেন, রোগীর বুকের ভিতর যে শব্দ হয়, তাও তো এই রকমে বাইরে থেকে শোনা যেতে পারে। তিনি প্রথমে একরকম কাগজের চোঙা ও পরে একরকম কাঠের চোঙা ব্যবহার করে রোগীর বুকের রকমারি শব্দ কানে শুনতে পেলেন। আজকালকার স্টেথোস্কোপ তারই উন্নত সংস্করণ।
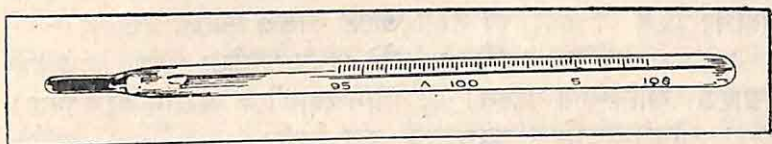
থার্মোমিটার

ইন্‌জেকসন দেবার পিচকারি (সিরিঞ্জ)ঃ

এই পিচকারিতে চাপ দিলে ওর মুখে লাগানো ফাঁপা ছুঁচের ভিতর দিয়ে ওষুধ রোগীর দেহে প্রবেশ করে। রোগীর মুখ দিয়ে ওষুধ খাওয়ালে তার ফল হতে সময় লাগে। কিন্তু ইন্‌জেকসনে সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রানসিস রিড এই সিরিঞ্জ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

ক্লোরোফর্মঃ

আমরা এ পর্যন্ত রোগ চিকিৎসায় ওষুধ, ইন্‌জেকসন ও টিকার কথা বলেছি। কিন্তু আর এক ধরনের চিকিৎসার খুবই দরকার হয়। সেটা হচ্ছে অস্ত্র চিকিৎসা। নানা কারণে অনেক সময় রোগীর শরীরকে কাটাকুটি করে তার প্রাণ রক্ষার দরকার হতে পারে। এ দরকারটা যে আমরা আজ অনুভব করছি তা নয়, বহু বছর আগে থেকেই অস্ত্র-চিকিৎসা চলে আসছে।

কিন্তু তখনকার অস্ত্র চিকিৎসা ছিল এক ভয়াবহ ব্যাপার। রোগীর

পরিত্রাহি চিৎকার শুনে আশপাশের অন্যান্য রোগীরা দুড়দাড় করে ছুটে পালাতো। সামান্য দাঁত তুলতেও তখন রোগীকে জোর করে চিৎপাত করানো হত। তারপর যত রাজ্যের ঢাক-ঢোল কাঁসি বাজাবার ব্যবস্থা ছিল, যাতে রোগীর আর্তনাদ শুনে অন্য রোগীরা চম্পট না দেয়!

তখনকার দিনে অস্ত্রোপচারের রোগীর হাত-পা বেশ শক্ত করে বেঁধে নেওয়া হত, তার উপর কয়েকজন জোয়ান লোক তাকে চেপে ধরত। অস্ত্রোপচারের ভয়াবহ যন্ত্রপাতি সে দেখতে পেত। তার কষ্ট ছিল অবর্ণনীয়। এই অবস্থায় ডাক্তারকে কসাইয়ের মত ছুরি-কাঁচি চালাতে হত রোগীর দেহে। সেই বিভীষিকাময় অসহ্য যন্ত্রণাতেই তখন বহু রোগীকে প্রাণ হারাতে হত।

কিন্তু ব্যথার ব্যথী মানুষ তখনও ছিল। কি করে অস্ত্রোপচারের রোগীর কষ্ট লাঘব করা যায় সে চেষ্টা তাঁরা করেছেন। এজন্য গ্রীক, রোমান ও চীনের লোকেরা একরকম গাছের রসের গন্ধ রোগীর নাকে দিয়ে দিত। তাতে কিছু সময় রোগী অজ্ঞান হয়ে থাকলেও ওটা খুব নিরাপদ ছিল না এবং সব সময় তাতে কাজও ভালো হত না।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে হামফ্রি ডেভীই প্রথম 'লাফিং গ্যাস' (নাইট্রাস অক্সাইড) আবিষ্কার করেন। এই গ্যাস রোগীকে অজ্ঞান করে দিত। কিন্তু এটায় অত্যধিক রক্তপাতের ভয় ছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ডাঃ মর্টন আবিষ্কার করলেন যে, অস্ত্রোপচারের সময় 'সালফিউরাস ইথার' সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করে নিলে কিছুমাত্র ব্যথা লাগে না।

কিন্তু এগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ ছিল।

জেমস সিমসন ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের এক বড় ডাক্তার। অস্ত্রোপচারে কি ভাবে রোগীকে যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করা যায় এ নিয়ে তিনি ভাবছিলেন কিছুদিন থেকে। তিনি ডেভী ও ডাঃ মর্টনের আবিষ্কার রোগীদের জন্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন।

আজকাল প্রয়োজন হলে মায়ের পেট কেটে সন্তান প্রসব (সিজারিয়ান্ অপারেশন) করানো হচ্ছে। কিন্তু তখনকার দিনে কত মাকে যে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে ও প্রাণ দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

সিমসন মায়েদের এই কষ্ট লাঘবের জন্য কঠিন ডেলিভারি কেস-এ নাইট্রাস অক্সাইড বা ইথার ব্যবহার করতে লাগলেন।

কিন্তু জনহিতকর নতুন কিছু করতে গেলে চিরকালই আর একদল তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন। গ্যালিলিও যখন প্রচার করলেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে

ঘোরে, তখন গীর্জার পুরোহিতরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। কারণ, বাইবেলে লেখা আছে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। অতএব গ্যালিলিও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন বলে তাঁর নামে নালিশ হল রোমে।

গ্যালিলিও বললেন—বাইবেল বিজ্ঞান শিক্ষার বই নয়। মুক্তির পথ দেখানোই বাইবেলের কাজ। অতএব বাইবেল যা বলবে, তা যে বৈজ্ঞানিক সত্য হতেই হবে, তা নয়।

কিন্তু তাঁর যুক্তি সেদিন টেকেনি। সমন এল তাঁর নামে। সত্তর বছর বয়সে তাঁকে জেলে পোরা হল। আটাত্তর বছর বয়সে কারাগারেই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়।

সিমসনের বিরুদ্ধেও ধর্মযাজকরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তাদের নালিশ, সন্তান প্রসবের সময় মায়ের কষ্ট নিবারণ করা মহাপাপ। কারণ বাইবেলে লেখা আছে ঈশ্বর মায়েদের Woe-man অর্থাৎ দুঃখের মানুষ বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন—In sorrow thou shall bring forth children—অর্থাৎ অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করে তোমাদের সন্তান প্রসব করতে হবে। সিমসন মায়েদের এই কষ্ট লাঘব করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

সিমসনও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি এর এমন একটা মোক্ষম জবাব দিলেন যে বাইবেলওয়ালারা আর উচ্চবাচ্য করতে পারল না। তিনি বললেন,—ঈশ্বর যে পথ দেখিয়েছেন আমি সেই পথই অবলম্বন করেছি। আদমের পাঁজরা থেকে 'ইভ'-এর সৃষ্টি। ঈশ্বর এই পাঁজরা নেওয়ার সময় আদমকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিলেন—বাইবেলেই এ কথা লেখা আছে। এই গভীর ঘুম মানে ঈশ্বর তাকে হতচেতন অর্থাৎ অজ্ঞান করে নেন। অতএব ঈশ্বরই এ্যানাস্থেটিক বা চেতনানাশক দ্রব্যের প্রথম প্রবর্তক। আমি তাঁরই পদানুসরণ করেছি মাত্র।

যা হোক, এরপর কিন্তু সিমসন ঐ লাফিং গ্যাস বা ইথার ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। এর চাইতেও ভালো কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় রইলেন। দুজন সহকারী নিয়ে তিনি এই পরীক্ষায় তন্ময় হয়ে রইলেন।

একদিন সিমসন তাঁর এক রাসায়নিকের কাছ থেকে একটা ওষুধ পেলেন। কিন্তু ঐ ওষুধটা তাঁর খুব কাজে আসবে বলে মনে হল না। তিনি ওটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন।

এর কয়েকদিন পরে তিনি তাঁর সহকারীদের নিয়ে কাজে বসলেন। কিন্তু কোনটাতেই কিছু সুবিধা করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি ফেলে দেওয়া ওষুধটাই পরীক্ষার জন্য কুড়িয়ে নিয়ে এলেন।

তিনজন সেই ওষুধটা নাকে শুঁকলেন। তাঁদের চোখ লাল হয়ে উঠল, মনে স্ফূর্তি এল। তারপর চেঁচামেচি এবং পরক্ষণেই সব চুপ!

সিমসন তার দু'জন বন্ধু সটান পড়ে গেলেন টেবিলের নীচে! সিমসনের চাকর প্রভুর এই অবস্থা দেখে মনে করল, অনভ্যাসের ফোঁটা! গলায় কিছু ঢেলে বোধ হয় তাঁদের এই অবস্থা হয়েছে। অগত্যা সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

সেদিন ১৮৪৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর। চেতনানাশক যে বস্তুর খোঁজে সিমসন এতদিন লেগেছিলেন সেই ক্লোরোফর্ম সে রাতে এমনি একটা মজার ঘটনার মধ্যে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হ'য়ে পড়ল! চেতনানাশক দ্রব্য হিসাবে ক্লোরোফর্ম এরপর সর্বত্র ব্যবহৃত হতে লাগল। আজও আমাদের দেশের গাঁয়ের লোকেরা পর্যন্ত কঠিন অস্ত্রোপচারের রোগীকে সাহস দিয়ে বলে—ভয় কি! 'কলেরাফরম' করে নিলে কিছু টের পাওয়া যাবে না। ক্লোরোফর্ম এত খ্যাতি লাভ করেছে যে, অন্য যে কোনও চেতনানাশক দ্রব্যের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করা হোক না কেন, রোগীকে বলতে শোনা যায় যে তাকে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছে!

অস্ত্র চিকিৎসায় ক্লোরোফর্ম ও সিমসনের নাম কোনদিনই মুছে যাবার নয়।

অ্যানাস্থেসিয়াঃ 'অ্যানাস্থেটিক' কথাটি বলা হয়েছে এর আগে। কথাটি গ্রীক। এর অর্থ চেতনানাশক বস্তু। আর চেতনা নাশ করা অর্থাৎ অজ্ঞান করাকে বলে অ্যানেস্থেসিয়া। ক্লোরোফর্ম, লাফিং গ্যাস বা ইথার—নাক দিয়ে গন্ধটা নিতে হয়। এছাড়া ইন্‌জেকসন দিয়েও অজ্ঞান করার প্রথা আজকাল প্রচলিত হয়েছে। 'স্কোপোলামিন' নামে এক রকম ওষুধ বেরিয়েছে যা দেহে ঢোকামাত্রই রোগী অর্ধ-চেতন হয়ে পড়ে। তখন সে অস্ত্রোপচারের সব কিছু বুঝতে পারলেও কোন যন্ত্রণাই অনুভব করে না।

এই রাসায়নিকগুলি সারা দেহেরই চেতনানাশ করে। এ ছাড়াও কয়েক রকম ওষুধ বেরিয়েছে, তাদের কাজ দেহের কোনও বিশেষ জায়গায় চেতনা লোপ করা। খানিকটা ইথার বা ইথাইল ক্লোরাইড চামড়ায় স্পর্শ করালে জায়গাটা তখনই অসাড় হয়ে যায়। তখন সেখানে যন্ত্রণার অনুভব ক্ষমতা থাকে না। চামড়ার উপর কিছুক্ষণ বরফ রাখলেও সেখানকার স্নায়ুগুলি অসাড় হয়ে যায়, ফলে সেখানে যন্ত্রণার অনুভূতি থাকে না।

কার্বলিক এ্যাসিডঃ কঠিন অস্ত্রোপচারের আগে অ্যানাস্থেটিক

ব্যবহার যেমন অনস্বীকার্য, অস্ত্রোপচারের পরে অ্যানটিসেপটিক কার্বলিক এ্যাসিডও তেমনি অপরিহার্য।

একথা ভাবলেও অবাক হতে হয় যে, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও যদি কোন অস্ত্রোপচারের রোগী হাসপাতাল থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারত, তবে সেটাকে বলা হত নেহাৎ বরাতের জোর।

বন্দুকের গুলির ক্ষতটা ক্লেশকর, এমন কি প্রাণান্তকরও হতে পারে। কিন্তু এখন সেটা তখনকার দিনের ডাক্তারের প্রতিবিধানের চেষ্টার চেয়ে কষ্টকরও নয়—প্রাণান্তকরও নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা যায়, গোলাগুলি লেগে কোথায়ও বিষাক্ত হয়ে গেলে একরকম তেল অথবা চিটে গুড় আগুনে ফুটিয়ে নিয়ে সেই ফুটন্ত তেল সেখানে ঢেলে দেওয়া হ'ত!

গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও তলপেটে কোন ক্ষত হলে রোগীর বাঁচার কোনও আশা থাকত না। এ ধরনের রোগীকে ডাক্তাররা হিসাবের বাইরে রেখে দিতেন! আর আজ? তলপেটে অস্ত্রোপচার তো এখন আকছার হচ্ছে—এবং সব রোগীই ভালো হয়ে যাচ্ছে।

অস্ত্র চিকিৎসায় এত বড় একটা পরিবর্তন এল কি করে? দুটি শব্দে এর উত্তর দেওয়া যায়—যোশেফ লিষ্টার। লিষ্টার ডাক্তারী পাশ করার পর থেকে ক্ষত চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের দিকে ঝোঁক দিলেন বেশি। তিনি দেখলেন, অস্ত্রোপচারের পর অধিকাংশ রোগীই হাসপাতালের নোংরামির জন্য মারা পড়ে। কেবল হাসপাতাল কেন, ডাক্তারদেরও রোগ জীবাণু কি ভাবে ছড়ায় সে সম্বন্ধে জ্ঞান কাণ্ড ছিল কম।

আমাদের দেশে এখনও বোধ হয় অনেক উকিল মনে করেন যে, গাউনটা যত পুরনো, ছেঁড়া আর নোংরা হবে ততই তাঁর অভিজ্ঞ বলে পশার জমবে বেশি। লিষ্টারের সময়েও অনেক ডাক্তার ছিলেন, যাঁরা একই কোট গায়ে দিয়ে পাঁচ-দশ বছর বিভিন্ন রোগীর অস্ত্রোপচার করে যাচ্ছেন। সেই কোটে রক্ত, পুঁজ লেগে একটা কোটিং পড়ে যেত। যার কোট যত পুরনো, নোংরা সেই ডাক্তারই ঐ কোট গায়ে দিয়ে নিজেকে খুব বিচক্ষণ বলে বড়াই করতেন। অথচ ঐ কোটের মাধ্যমেই অন্য রোগীর ক্ষত বিষিয়ে যাওয়ায় জীবাণু ছড়িয়ে পড়ত!

এর আগে অবশ্য পাস্তুর রোগ জীবাণুর কথা, কি ভাবে তারা বংশবৃদ্ধি করে, কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা বলেছিলেন। কিন্তু ধুলোবাতাসে কি করে জীবাণু থাকে, তখনকার অনেকেই তা বুঝতে পারতেন না।

লিষ্টার তা বুঝিয়ে দিলেন। প্রমাণ করে দিলেন যে, ক্ষতস্থান জীবাণু দ্বারা বিষাক্ত হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে রোগীদের অনেকেই আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু লিষ্টার দিনরাত ভাবেন, কি

করে এইসব শয়তান জীবাণুদের ধ্বংস করা যায়।

অনেক পরীক্ষার পর লিষ্টার স্থির নিশ্চিত হলেন যে, কার্বলিক এ্যাসিডই হ'চ্ছে রোগ জীবাণুকে নষ্ট করবার সব চেয়ে ভালো ওষুধ। এটা ক্ষতস্থানে দেওয়া যায়, বাতাসেও ছড়িয়ে দেওয়া চলে। তাতে রোগ-জীবাণু মরে কিন্তু কোন কিছুর ক্ষতি হয় না। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি তিনি জীবাণু-মুক্ত (sterilization) করবার ব্যবস্থা করলেন, ডাক্তার ও নার্সদের নাকে ওষুধ দেওয়া পাতলা কাপড় ব্যবহার করবারও প্রথা প্রচলিত হ'লো। লিষ্টার হাসপাতালের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে দিলেন।

এক্স-রেঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোথায় কোন্ রোগ-জীবাণু চুপ করে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে, তা ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা হচ্ছে বাইরের ব্যাপার। রোগীর শরীরের ভিতরে কোথায় কি গলদ হয়েছে, বাইরের থেকে তা কি করে ধরা যাবে?

ঝুম্পা মেয়েটি বড় ছট্‌ফটে। একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে সে পা-পিছলে পড়ে গেল। সে আর হাঁটতে পারে না। পা উঠল ফুলে। যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারে না। তর কি হয়েছে কি করে বোঝা যাবে?

নিয়ে যাও তাকে হাসপাতালের এক্স-রে ঘরে। ডাক্তার বলে দেবেন হাড়ের জোড়া খুলেছে কিনা (dislocation), চটলা উঠেছে কিনা (simple fracture) অথবা হাড় ভেঙে গিয়েছে (compound fracture) কিনা। কেবল তাই নয়, ঝুম্পার ঐ পায়ের একখানি ফটো তুলে তোমাদের সামনে ধরা হবে। না, না—সাধারণ ফটো নয় সেটা। এ ফটোতে কেবল তার পায়ের লম্বা দুটি হাড় আর ছোট হাড়টি দেখা যাবে। এবং কোন্ হাড়টি ভেঙেছে বা মচ্‌কে গিয়েছে তাও জানা যাবে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে—বিশেষ ক'রে অস্ত্রচিকিৎসায় এই এক্স-রে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে।

একদিন আকস্মিক ভাবেই এই এক্স-রে ধরা পড়েছিল। জার্মানীর অধ্যাপক রন্টজেন সাহেব একদিন একটা বায়ুশূন্য কাচের নলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে কি একটা পরীক্ষা করছিলেন। এই নলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলবার সময় বিভিন্ন রংয়ের স্পার্ক দিচ্ছিল। কাছেই একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে ছিল ফটো তুলবার কতকগুলি প্লেট। যাতে ঐ প্লেটগুলিতে আলো না লাগে—সেজন্য নীল রংয়ের মোটা কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছিল সেগুলি। রন্টজেন সাহেব ঐ বাক্স খুলে প্লেটগুলি তুলে দেখেন, কি ভাবে আলো লেগে প্লেটগুলি একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে।

কিন্তু সেগুলি যে অবস্থায় ছিল, তাতে নষ্ট হওয়ার কথা নয়। মুখ-আঁটা বাক্সে প্যাকিংয়ের মধ্যে যে প্লেট—তাতে আলো লাগবে কোন্ পথে?

রণ্টজেন দেখলেন, যে ভাবেই হোক্, আলো তাতে লেগেছে। তখন তিনি পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন এবং এর থেকেই আবিষ্কার করলেন যে, বায়ুশূন্য কাচের নলের (Crooke's tube) ভিতর দিয়ে ঋণ-রশ্মি (cathode rays) বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ে কোন জিনিসে যখন ধাক্কা পায়, তখন আর এক রকম রশ্মি বেরিয়ে আসে। এই রশ্মি সাধারণ রশ্মি নয়। এর বিশেষত্ব এই যে, যে-সব জিনিস সাধারণ আলোক রশ্মির পথে বাধা দেয়, সেগুলি কোনক্রমে এই রশ্মিকে বাধা দিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়ে যেমন আলো চলে, এই রশ্মিও তেমনি মাংস ভেদ করে বাইরে আসে। কিন্তু যেখানে ঘনত্ব খুব বেশি, সেখান দিয়ে এই আলো যেতে পারে না। তামা, দস্তা, এ্যালুমিনিয়াম এবং পাথর প্রভৃতির ভিতর দিয়ে এই আলোক রশ্মি যেতে পারে না। রণ্টজেন নিজের একখানি হাত নিয়ে পরীক্ষা করলেন। কি আশ্চর্য! তাঁর হাতের ভিতরের হাড়ের ছবি স্পষ্ট ক'রে ফুটে উঠল! সেটা ১৮৯৫ সালের ঘটনা।

এটা কোন্ আলো তখন তিনি তা' ধরতে না পারায়, তখনকার মত তিনি তার নামকরণ করেছিলেন—এক্স্ (X)-রে অর্থাৎ অজানা আলো। সেই থেকে এই আলোর নাম—এক্স-রে বা রণ্টজেন সাহেবের নামানুসারে রণ্টজেন রে। চল্‌তি কথায় আমরা এখন এটাকে রঞ্জন রশ্মিও বলি।

অন্ধকারে আলো দেখিয়েছে এই রশ্মি। দেহের ভিতরের সব কিছুই আমরা এখন এই রশ্মির সাহায্যে দেখতে পাই!—কোথায় কি হয়েছে অতি সহজে নির্ণয় করতে পারি। কেবল নির্ণয়ই বা কেন, নানা রকম চর্মরোগ এবং যকৃতের চিকিৎসাতেও রোগগ্রস্ত জায়গায় এই আলো ফেলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাচ্ছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রণ্টজেন তাঁর এই বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

ক্যানসার চিকিৎসায় রেডিয়ামঃ রেডিয়াম একরকম সাদা গুঁড়ো। এটা দেখতে কতকটা নুনের মত। রেডিয়াম অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বলে এর খুব দাম। সারা পৃথিবীতে মাত্র কয়েক চামচ রেডিয়াম পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু রেডিয়ামের শক্তি এত বেশি যে, এর মাত্রা একটু বেড়ে গেলেই মারাত্মক হয়ে পড়বে! কোথাও যদি একসঙ্গে অনেকখানি

রেডিয়াম থাকে, তা'হলে তার ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষতে পারবে না— কাছে গেলেই মৃত্যু! সে মৃত্যুটা আবার এমন যে, তুমি জ্বালা-যন্ত্রণা টের পাবে না কিছু। তুমি এসে রেডিয়াম হয়ত ঘাটলে—বুঝতে পারলে না ওটা মারাত্মক কিসে। কিন্তু দু' এক সপ্তাহ পরেই দেখবে, তোমার দেহ থেকে চামড়াটা খসে যাচ্ছে, চোখে তুমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না! তারপর মৃত্যু অবধারিত।

অন্ধকারে রেডিয়ামকে দেখলে মনে হবে, আগুন জ্বলছে। সব চাইতে আশ্চর্য এই যে, যখন রেডিয়াম থেকে আলো উত্তাপ বিকীর্ণ হয়, তখন এর কিছুমাত্র ওজন কমে না। একখণ্ড কয়লা যদি অনেক বছর ধরে পুড়তে থাকে—আলো দেয়, উত্তাপও দেয় অথচ তার ওজন কমে না, ছাইতেও পরিণত হয় না—তাহলে কেমন হয় ভেবে দেখ!

অনেক বস্তুই—যা রেডিয়ামের সংস্পর্শে আসে, তা হয়ে যায় 'রেডিও এ্যাকটিভ'। এর অর্থ অন্য বস্তু রেডিয়ামের সংস্পর্শে এলে সেটা অন্ধকারে আলোকিত হওয়ার ক্ষমতা লাভ করে।

ঘড়ির ডায়ালে অনেক সময় রেডিয়াম দেওয়া থাকে। আশ্চর্য কথা যে, অল্প দামের ঘড়িতে কি করে বহু মূল্য রেডিয়াম দেওয়া হয়।

আসলে ওটা কিন্তু রেডিয়ামই নয়। যে বস্তুটা দীপ্তি দেয়, ওটা হচ্ছে 'জিংক সালফেট'। জিংক যত ভালো হবে, তার দীপ্তিও হবে তত বেশি।

রেডিয়াম আবিষ্কার করেন ম্যাডাম কুরী। ক্যানসার রোগের একটি বিখ্যাত ওষুধ এই রেডিয়াম। ক্যানসার রোগীকে এর সাহায্যে আরোগ্য করবার চেষ্টা চলছে। ক্যানসার দুরারোগ্য ব্যাধি। বর্তমানে এর চিকিৎসার জন্য যথা সময়ে অস্ত্রোপচার এবং আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে।

লিউকেমিয়া : লিউকেমিয়া কথাটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। রক্তের ক্যানসারকে লিউকেমিয়া রোগ বলা হয়ে থাকে। শরীরের কোনও অংশের কোষগুলি যদি অন্য কোষগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে যথেচ্ছ বেড়ে চলে, তখন তাকে আমরা ক্যানসার বলি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কতকগুলি রাসায়নিক জৈব পদার্থ এই রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। রোগের লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আল্‌ট্রা ভায়োলেট রশ্মি অথবা অস্ত্রোপচার ইত্যাদির সাহায্যে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই ক্যানসারের চিকিৎসা সম্ভব।

লিউকেমিয়া কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে। লিউকস মানে শ্বেত এবং হাইমা কথাটির অর্থ হলো রক্ত। রক্তে শ্বেত কণিকার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে লিউকেমিয়া হয়ে থাকে।

লিউকেমিয়া রোগের বিশেষ কোনও বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না। তবে রক্তাল্পতা, অল্প অল্প জ্বর, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, ওজন হ্রাস ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। অবশ্য এই উপসর্গগুলি আরও অনেক রকম রোগের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কাজেই শুধু এই উপসর্গ দিয়েই রোগীকে চেনা যায় না, বিশদভাবে রক্ত পরীক্ষার দ্বারাই শুধু এই রোগ ধরা সম্ভব।

রক্তকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেছে—জল, হর্মোন, প্রোটিন ইত্যাদি বস্তু ছাড়াও এর মধ্যে আছে কতকগুলি জীবন্ত উপাদান। এগুলি হলো লোহিত কণিকা, থ্রম্বোসাইট এবং শ্বেত কণিকা। লোহিত কণিকার ভিতরের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে শরীরের নানা স্থানে পৌঁছে দেয় এবং রক্তে এদের সংখ্যা কমে গেলে অ্যানিমিয়া হয়। কোনও জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকলে থ্রম্বোসাইট সেখানকার রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং অধিক রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। শ্বেত কণিকাগুলি সৈনিকের মত আমাদের দেহকে বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

যে সকল জীবকোষ শরীরে রক্ত উৎপাদন করে থাকে, তারা সব সময় লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং থ্রম্বোসাইট সৃষ্টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে চলে। যদি কোনও কারণে শ্বেত কণিকা সৃষ্টি-কারী জীবকোষগুলি এই কণিকাগুলির উৎপাদনের উপর তাদের প্রভাব বজায় না রাখতে পারে অর্থাৎ যদি তাদের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তবে রক্তে শ্বেত কণিকার প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং লিউকেমিয়া রোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

এজন্যে লিউকেমিয়া প্রতিরোধ করতে গেলে রক্তের শ্বেত কণিকা সৃষ্টিকারী কোষগুলির গতিবিধি এবং কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে হবে এবং তারা যাতে খুসীমত শ্বেত কণিকা তৈরি করতে না পারে—সেটাও দেখতে হবে।

আজ পর্যন্ত লিউকেমিয়ার কোনও অব্যর্থ ওষুধ আবিষ্কার হয়নি, তবে হর্মোন ইঞ্জেকশন ও নানা প্রকার ওষুধের সাহায্যে রোগীকে সাময়িকভাবে সুস্থ রাখা সম্ভব। লিউকেমিয়া রোগের কারণ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে আধুনিক রসায়নবিদরা মনে করেন যে, এই রোগ ভাইরাস ঘটিত এবং এর প্রতিষেধকও ভবিষ্যতে আবিষ্কার করা যাবে।

স্যাকারিনঃ বহুমূত্র (ডায়াবিটিজ) রোগে আক্রান্ত রোগীকে ডাক্তারেরা অনেক সময় চিনি খেতে বারণ করেন। তাঁরা তখন চিনির বদলে স্যাকারিন খান। স্যাকারিন চিনির চেয়ে তিনশো গুণ বেশি মিষ্টি।

একদিন আমেরিকার রাসায়নিক পণ্ডিত ইরা রেমপেন তাঁর লেবরেটরীতে আলকাত্‌রা নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষা করবার পর—নিজের ঘরে এসে খেতে ব'সে দেখেন, যা মুখে দেন তাই-ই মিষ্টি!

রান্নার সময় নুনের বদলে ভুল করে চিনি দিয়ে রাঁধুনীই এই কাণ্ড করে রেখেছে মনে করে তাকে তিনি একচোট ধমকালেন খুব।

কিন্তু রাঁধুনী বেচারীর দোষ নেই—রান্নাঘরের ত্রিসীমানায়ও চিনি ছিল না।

রেমপেন তাঁর আঙুলে জিভ লাগিয়ে দেখেন,—মিষ্টি আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বুঝলেন মিষ্টিটা রান্নায় নয়—তাঁর হাতে। তখন তিনি খাওয়া ফেলে ছুটলেন সেই লেবরেটরীতে। সেখানে পরীক্ষা করে দেখলেন, আলকাতরা থেকে এমন একটা জিনিস তৈরি হয়েছে যা চিনির চেয়েও বেশি মিষ্টি। ওরই নাম দেওয়া হয়েছে—'স্যাকারিন।'

গ্লুকোজ ঃ কঠিন অসুখের সময় গ্লুকোজ খেতে দেয়। বিশেষ করে টাইফয়েড হলে গ্লুকোজ গোলা জল খাইয়ে শরীর তাজা রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। এই গ্লুকোজটাও আসলে এক জাতের চিনি। আমরা সাধারণতঃ যে চিনি খাই ওটা হচ্ছে আখ থেকে তৈরি। তাছাড়া বিট, ফল এবং দুধ থেকেও চিনি তৈরি হয়। এই চিনির বিভিন্ন নাম আছে। গ্লুকোজও এই রকমের একটি। এটা তৈরি হয় আঙুর থেকে।

লিভার গ্লুকোজ সৃষ্টি করে রক্তস্রোতে মিশিয়ে দেয়। পেশীতে গিয়ে ওটা আমাদের শক্তি যোগায়। গ্লুকোজ আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য একান্ত দরকারী। দেহের তাপ ও শক্তি তৈরি হয় এই গ্লুকোজ দিয়ে। আমরা যে শ্বেতসার জাতীয় জিনিস খাই, সেগুলিই শরীরের ভিতর গিয়ে ভেঙে চুরে এই গ্লুকোজে পরিণত হয়—আর সেই গ্লুকোজই শরীরকে তাজা রাখে। অসুখ-বিসুখের সময় শরীর দুর্বল হলে তাই সরাসরি গ্লুকোজ দেবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

শ্বেতসার বা ষ্টার্চ-এর বৈজ্ঞানিক নাম—কার্বোহাইড্রেট। এই কার্বোহাইড্রেটকে কৃত্রিম উপায়ে সহজেই গ্লুকোজে পরিণত করা যায়। গ্লুকোজ আজকাল সেই ভাবেই তৈরি হয়ে বাজারে বিক্রী হয়।

আমরা কি করে বেঁচে থাকি ?

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা যায়—বল তো আমরা কি করে বেঁচে থাকি ? তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বলবে—আমাদের দেহে যে সব যন্ত্র আছে, হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, পাকস্থলী প্রভৃতি তাদের জন্যেই আমরা বেঁচে আছি। চোখ, কান, নাক, জিভ এসব আছে ব'লে আমরা দেখতে শুনতে ও নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। আর হাত-পা, মুখ, পেশী আছে বলে আমরা চলতে ফিরতে পারি।

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। কিন্তু এতে আসল কথাটা বলা হল না। ট্রেন-গাড়ীর রেলের লাইন আছে, এঞ্জিন আছে, চাকা আছে—তাতেই কি ট্রেন চলবে ?—না। চলবার জন্যে একটা শক্তি চাই। জল কয়লার একটা বাষ্প শক্তি তৈরি হয়, তাতেই ট্রেন চলে। অবশ্য তার গতি আর কোন্ পথে চলবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে চালক। আমাদের দেহেও প্রয়োজনীয় সব রকম যন্ত্রপাতি থাকলেও আমরা কিন্তু বেঁচে থাকতে পারি না। সে জন্য চাই একটা শক্তি—একটা উত্তাপ। একটা মরা মানুষের শরীরের মধ্যে যন্ত্রপাতি সবই আছে—কিন্তু কোন যন্ত্রই চলছে না। লোকটির দেহ ঠাণ্ডা বরফ !

ট্রেন চালাতে হলে যেমন এঞ্জিনে জল কয়লা দিতে হবে—তেমনি খাদ্য, বায়ু, জল, সূর্যকিরণ প্রভৃতি পাই বলেই দেহের স্বাভাবিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা বেঁচে আছি। আমাদের চালক অর্থাৎ ড্রাইভার হচ্ছে আমাদের মন।

জন্মের পর নানা রকম খাদ্য দ্বারা আমাদের দেহের পুষ্টি হয়। দেহের সজীব জীবকোষগুলি খাদ্য চায়। ক্ষিদে পেলে তা বোঝা যায়। জীবিত মানুষের শরীরে তাপ থাকে। খাদ্য দ্বারা এই তাপের সৃষ্টি হয়। পরিশ্রম করলে শরীরের ক্ষয় হয়। খাদ্য ও বিশ্রাম এই ক্ষয় পূরণ করে। যে যত বেশি পরিশ্রম করে তার খাদ্যও তত বেশি দরকার। বেঁচে থাকতে হলে, দেহযন্ত্রকে চালাতে হলে, চাই পরিমিত খাদ্য।

তাপঃ কিন্তু আমাদের শরীরে কি ভাবে তাপ উৎপন্ন হয় ? এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কারুর মতে রক্তকণাগুলির মধ্যে সংঘর্ষণের ফলেই তাপের উৎপত্তি। কেউ বলেন, হৃদ্‌পিণ্ড আর রক্ত-বহানালীগুলির মধ্যে সংকোচন ও প্রসারণের জন্যেই তাপের সৃষ্টি।

আর একজন বিজ্ঞানী বললেন, ফুসফুসের মধ্যে রক্তের সঙ্গে অক্সিজেন মিশ্রণের ফলে সমস্ত শরীরেই উত্তাপের সৃষ্টি হয়।

আমাদের শরীরের তাপ বাইরের উত্তাপের চেয়ে কিছু বেশিই থাকে। এই তাপ আবার সারাদিন সমানভাবে থাকে না। খুব ভোরে থাকে সবচেয়ে কম। তারপর আস্তে আস্তে বেড়ে সন্ধ্যাবেলায় সবচেয়ে বেশি হয়। আবার রাত্রিতে ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

শরীরের তাপ স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তাকে জ্বর বলা হয়। জ্বর কোন রোগ নয়—রোগের লক্ষণ-মাত্র। শরীরের মধ্যে কোনও রোগজীবাণু ঢুকে শরীরের ক্ষতি করবার চেষ্টা করলে জ্বর তা জানিয়ে দেয়। জ্বর হচ্ছে রোগের একটা উপসর্গ। ওষুধ খেয়ে রোগ-জীবাণু ধ্বংস হলে জ্বরও কমে যায়। বিভিন্ন রোগ ও তার প্রকোপ অনুসারে জ্বরেরও তারতম্য হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে অসম্ভব কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে—আবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে জ্বরের বিরাম হয় না। তাপের কিছুটা তারতম্য হয় মাত্র।

আমাদের খাদ্যঃ শক্তি সঞ্চয়, শরীরের ক্ষয়পূরণ ও শরীর গঠনের জন্য খাদ্যের দরকার হয়। কোন খাদ্য শরীরের তাপ ও শক্তি দেয়। আবার কোন খাদ্য শরীর গঠনের কাজ করে।

কিন্তু কোন্‌টা আমাদের খাদ্য, কোন্‌টা নয়—তা আমরা কি করে বুঝব? আমরা ঢ্যাঁড়শ খাই, টম্যাটো খাই, কিন্তু পিটুলীর ফল খাই না কেন?

আমরা যা কিছুই খাই না কেন—তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সেগুলি পাঁচটি রাসায়নিক জিনিসের সংমিশ্রণে তৈরি। স্বাস্থ রক্ষার জন্য এর কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। যেমন—শর্করা জাতীয় পদার্থ (কার্বহাইড্রেট)—বেশি আছে চাল, গম, আলু ইত্যাদিতে। ছানা জাতীয় পদার্থ (প্রোটিন)—বেশি আছে মাছ, মাংস ও ডিমে। স্নেহ বা চর্বি জাতীয় পদার্থ (ফ্যাট)—তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদিতে থাকে। খনিজ পদার্থ—লবণ, লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এইসব। খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন)—বহু খাদ্যে অল্প পরিমাণ থাকে। ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই বিভিন্ন খাদ্যে পাওয়া যায়। দেহের নানা প্রয়োজনে এগুলি একান্ত দরকার।

তাছাড়া আমরা প্রত্যহ যে সব খাদ্য খাই তার সঙ্গে অনেক জল থাকে। খাদ্য পরিপাকের জন্য জলের দরকার।

প্রোটিন শরীরের বৃদ্ধি করে এবং পরিশ্রমের ফলে দেহের ক্ষয়-প্রাপ্ত অংশকে গড়ে তোলে। চর্বি ও শর্করা জাতীয় দ্রব্য শরীরের তাপ শক্তি বৃদ্ধি করে। ভিটামিন শরীরের রাসায়নিক কাজটা নিয়মিত

চালায়—যার ফলে আমাদের দেহে ও মনে স্ফূর্তি থাকে আর অনেক রোগের হাত থেকে রেহাই পাই। খনিজ পদার্থ না হলে হাড়, রক্ত এইসব উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হত না। খাদ্যের এই উপাদানগুলি কার কতটা দরকার তা নির্ভর করে তার বয়স ও কাজের উপর।

যে সব খাদ্যে শরীরের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পাওয়া যায়, সেই-গুলিই আমাদের খাদ্য। মনুষ্য সভ্যতার সেই আদিম কাল থেকেই আমাদের খাদ্যাখাদ্য ঠিক হয়ে আছে। কোন্ ফলটা খেলে শরীর ভালো থাকে—কোন্‌টা খেলে থাকে না, এইভাবে বিচার করেই বোধ হয় আমাদের বহু পূর্বের মানুষ খাদ্য ঠিক করেছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে কোন্ খাদ্যে শরীর ভালো থাকে, কোন্ খাদ্যে থাকে না—এই প্রশ্নের জবাব আমরা অনুসন্ধান করে বের করেছি। চিকিৎসা বিজ্ঞানও এই সূত্র ধরে এগিয়ে চলেছে আজ। ভিটামিনও এইভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে, দেহের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কতক-গুলি রোগের প্রতিষেধের জন্য এই ভিটামিনযুক্ত খাদ্য না হলে চলে না। এদের এ, বি, সি, ডি, ই প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন গ্রন্থির কাজ ও হরমোন উদ্ভাবন

শরীরের বিভিন্ন অংশের কাজের কথা বলবার সময় থাইরয়েড ও পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের কথা কিছু কিছু বলা হয়েছে।

আমরা একই মানুষ—কেউ খুব লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ হাবা-গোবা আবার কেউ বা তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালী কেন ? আমাদের কেউ বা সুন্দর আবার কেউ বা কুৎসিত কেন হয় ?

পণ্ডিতেরা বলেন, শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি (গ্ল্যাণ্ড) থেকে যে রস সরবরাহ হয় তারই পরিমাণের উপর আমাদের দেহের গঠন ও বুদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে।

এই গ্রন্থিগুলিকে চারভাগে ধরা যায়—(১) গলায় থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড (২) পেটে কিডনীর উপরে সুপ্রারেনাল (৩) পুরুষ ও স্ত্রীবাচক গ্রন্থি (৪) মাথার খুলিতে মগজের নীচে—পিটুইটারী।

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড আমাদের পুষ্টির সহায়তা করে। এর অভাবে শরীর বাড়তে পারে না। মনও পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। প্রত্যেক থাইরয়েড গ্রন্থিতে আবার এক জোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। রক্তে ক্যাল-সিয়ামের ভাগ ঠিক রাখে এরাই।

সুপ্রারেনাল গ্রন্থির অভাবে রক্ত শুকিয়ে যেতে পারে, আবার এই গ্রন্থি-রসের অভাবে মানুষ কঠোর প্রকৃতি ও কর্কশাকৃতি হয়।

পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক গ্রন্থিগুলিই কোন মানুষকে পুরুষের আকার আবার কোন মানুষকে স্ত্রীলোকের আকার দেয়। গোড়াতে আমাদের দুটি গ্রন্থিই থাকে। পরে একটি বেড়ে এবং অপরটি শুকিয়ে গিয়ে আমরা কেউ পুরুষ এবং কেউ বা স্ত্রীলোক হ'য়ে যাই !

পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসৃত দশটি হরমোনের একটি হ'ল মানুষের দৈহিক বৃদ্ধির হরমোন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে এর সংক্ষিপ্ত নাম হয়েছে—এইচ. জি. এইচ অর্থাৎ হিউম্যান গ্রোফ হরমোন। মানুষ লম্বা ও মোটার দিক থেকে কতটা বৃদ্ধি পাবে তা নিয়ন্ত্রণ করে এই হরমোন। এটা প্রাণী দেহে রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপযোগী রোগপ্রতিরোধক বস্তুও সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই মানুষের শরীরের দরকারী রাসা-য়নিক বস্তুগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরির চেষ্টা করে আসছেন। মার্কিন বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এইচ. জি. এইচও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রচুর পরিমাণে এটা তৈরি হলে বিজ্ঞানীরা মূককে বাচাল করে দিতে পারবেন—পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘন করাতে পারবেন একদিন !

শরীরে লিভার কি কাজ করে

আমাদের পাকস্থলীর ডান দিকে থাকে লিভার। এটা দেখতে মেটে রংয়ের। এই লিভার আমাদের শরীরে যাদুকরের মত আশ্চর্য এমন সব কাজ করে যা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। একা লিভার শরীরের জন্য যত কাজ করে তত বোধ হয় আর কেউ করে না।

আমরা যখন কোনও কাজ করতে চাই তখন দেহে শক্তি আনবার জন্য পেশীতে জ্বালানী চায়। লিভার গ্লাইকোজেনের একটা অংশকে গ্লুকোজে পরিণত করে রক্তস্রোতে দিয়ে দেয়। পেশীতে গিয়ে সেটা আমাদের শক্তি সরবরাহ করে। পেশীগুলি যখন গ্লুকোজকে দাহ করে শক্তি সংগ্রহ করে তখন তার থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই অ্যাসিড শরীরে জমা হলে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এটাকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে লিভার ঐ সমস্যার সামাধান করে।

আমাদের হাত-পা কেটে গেলে রক্ত পড়ে। লিভার যদি শরীরে না থাকত তাহলে কোনক্রমেই এই রক্ত পড়া বন্ধ হত না এবং নিরন্তর রক্ত ক্ষরণে আমরা মরে যেতাম। লিভার এক ধরনের রস নিঃসৃত করে ঐ রক্তটাকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য দরকারী অ্যাণ্টিবডি তৈরি হয় এই লিভারে। অ্যাণ্টিবডি দেহে তৈরি না হলে সামান্য একটা ফুস্কুড়িতেও আমাদের মৃত্যু হতে পারত। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড থেকে হরমোন বেরিয়ে শরীরের বিভিন্ন কার্য প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করে। এই গ্ল্যাণ্ড থেকে অতিমাত্রায় হরমোন নিঃসৃত হলে আমাদের হাত-পা কঙ্কালসার করে তুলত। হরমোনের মাত্রাধিক্যটা লিভারই নষ্ট করে দেয়। আমাদের শরীরে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় নয় লক্ষ রক্ত কণিকার মৃত্যু হচ্ছে। এগুলিকে সরিয়ে ফেলা একান্ত দরকার। লিভারই তাদের দাবিয়ে রাখে। লিভার অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন এ, ডি এবং বি কমপ্লেক্স সঞ্চয় করে রাখে।

অনেক সময় হৃৎপিণ্ডে খুব বেশি রক্ত সঞ্চয় হলে তার পাম্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। অমনি লিভার প্রসারিত হয়ে সেই বাড়তি রক্তটাকে ধরে ফেলে এবং অধিক রক্তটাকে শোষণ করে নেয়।

লিভারে ক্যানসার একটা মারাত্মক রোগ। এই রোগীর শতকরা নব্বইজনের লিভারকে তুলে ফেলতে হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেছে. ওর গ্রন্থিটা কিছুদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় গড়ে উঠেছে!

যে ব্যাঙ্কে টাকা নেই কিন্তু জীবন আছে

টাকা নেই কোন্ ব্যাঙ্কে তোমরা জানো ?—ব্লাড ব্যাঙ্কে। অল্প কয়েক বছর আগে এই ব্যাঙ্কের পত্তন হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের কি কাজ এবং কি করেই বা এই ব্যাঙ্ক মৃতপ্রায় মানুষের জীবন দান করে সেই কথাই বলা হ'চ্ছে।

রক্ত সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমরা অনেক কথা জানো। আমাদের দেহের রক্তরস হচ্ছে একটা ফিকে হল্‌দে রস। এর মধ্যে থাকে লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা। লোহিত কণিকাগুলি অক্সিজেন পরিবেশন করে এবং সেখান থেকে দূষিত কার্বনিক এ্যাসিড বহন করে আনে।

শ্বেত কণিকাগুলির রং নেই। ওগুলি লোহিত কণিকার চেয়ে আকারে বড়। এরাই দেহের রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে। দেহের মধ্যে এরা একাধারে সৈনিক ও ঝাড়ুদারের কাজ করে। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রায় পাঁচশো লোহিত কণিকার মধ্যে থাকে মাত্র একটি করে শ্বেত কণিকা।

রক্ত নেওয়ার আগে দাতার দেহের উত্তাপ, রক্তের চাপ এবং রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

আদিম যুগ থেকেই দেখা যায়, বিপক্ষের রক্তক্ষয় ক'রে তাকে দুর্বল করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। আগেকার দিনে তলোয়ার, ছোরা, বল্লম,

বর্শা ও তীরের সাহায্যে এটা করা হত। এখন ওটা কামান-বন্দুক ও বোমার সাহায্যেই করা হয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, আহত ব্যক্তির দেহের রক্তরস—যা রক্ত কণিকা ও রসায়ন বস্তুকে দেহের মধ্যে বয়ে নেয়, আঘাত পাওয়ার ফলে তা আস্তে আস্তে দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরার মধ্যে চলে যায়। আহত ব্যক্তির দেহ থেকে যদি প্রচুর রক্তপাত নাও হয়, তাহলেও রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়ায় ক্ষতস্থান ঢাকা না থাকলে দূষিত (infection) হয়। তখন দেহে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনও সরবরাহ হয় না। কোথায়ও পুড়ে গেলে পুড়ে যাওয়া চামড়া থেকে রক্তরস খুব বেশি সরে যায়। সাধারণ থ্যাৎলানো জায়গাতেও ঐ রস কমে যায়। ফলে তাড়াতাড়ি রক্তের কাজ বন্ধ হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দেখলেন, রক্তস্রোতে আরও রক্তরস যোগান দিতে পারলে ঐ অসুবিধাটা দূর করা যেতে পারে। এর দ্বারা সরে যাওয়া রক্তকে আবার শিরা ও ধমনীতে ফিরিয়ে আনা যায়। যে রক্ত-কোষ দিয়ে রক্তটা সরে গিয়েছিল সেই পথেই তাকে ফিরানো হয়।
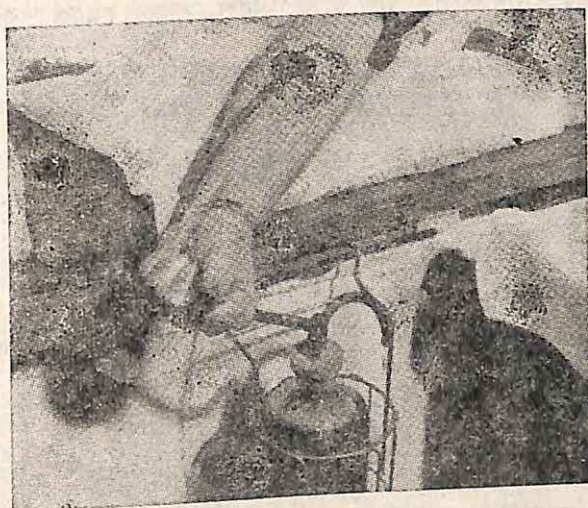
রক্তদাতার দেহ থেকে রক্ত বের করে নেওয়া হচ্ছে।

সারা জগতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হিড়িক লেগে যাওয়ায় সহানুভূতিশীল জাতিগুলি আহতদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সাধারণ "ব্লাড ব্যাঙ্ক" স্থাপন করল। কিন্তু তখন এর অসুবিধাও ছিল অনেক। রক্তগুলি জমা করার পর সেগুলি খারাপ হ'য়ে যেতে লাগল। এইসব রক্তের জন্য 'রেফ্রিজারেটর' খুব দরকার। কিন্তু যুদ্ধের সময় ওটা কোথায় পাওয়া যাবে? আরও দেখা গেল, আহত ব্যক্তির যে রকমের

রক্ত তাছাড়া অন্য রকমের রক্ত তার শরীরে ঢুকিয়ে দিলে—ভালোর চাইতে মন্দই হয় বেশি! তাড়াতাড়ি করে যে কোনও ব্যক্তির রক্ত আহতের শরীরে ঢুকানো খুবই ভুল।

মনে রাখতে হবে, রক্তটাকে ওর দাতার দেহ থেকে যে ভাবে টেনে নেওয়া হয়, সেই ভাবেই যে ওটা আহতের দেহে ঢুকানো হয় তা নয়। তা'হলে অবশ্য ব্যাপারটা খুবই সহজ হ'ত।

এরপরই এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হ'ল—রক্তকে শুকনো করে নেওয়া এবং সেটাকে অন্ততঃ পাঁচ বছর ধরে কাজে লাগানো।

এই আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠল বিরাট 'রেড ক্রস সোসাইটি'।

কামান-বন্দুকে হাত-পা উড়িয়ে দিক, উড়ো জাহাজ থেকে বোম্বিং হোক্—ভয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে এই শুকনো রক্তের গুঁড়ো জলে গুলে আহতের শরীরে ঢুকিয়ে তাকে চাঙ্গা করে তোলা যাবে। আর আর কাজের মধ্যে রক্ত যোগাড় করাও 'রেড ক্রসের' একটা বড় কাজ।

দুধ থেকে যেমন মাখন তোলা হয়, যাঁরা রক্ত সংগ্রহ করেন তাঁদেরও রক্ত যোগাড় করার পরের কাজ হচ্ছে কেবল—রক্তরস থেকে শ্বেত কণি-

ডিসটিল্ড ওয়াটার ও রক্তের গুঁড়ো শিশিতে রাখা হয়েছে। গুঁড়োর সঙ্গে ডিসটিল্ড ওয়াটার মিশিয়ে তবে রোগীর দেহে চালনা করা হবে।

কাকে আলাদা করাই নয়,—দুধ থেকে যেমন গুঁড়ো দুধ করা হয়, তেমনি ভাবে রক্তরসকে গুঁড়ো তৈরি করা। যাতে ঐ গুঁড়ো থেকে জলীয় অংশটা বেরিয়ে যায়, সেজন্য একটা সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য পাত্রে ওটা করা হয়।

বড় বড় হাসপাতাল বা রেডক্রস থেকে রক্তরস পাওয়ার পর লেবরেটরীর বিচক্ষণ বিজ্ঞানীরা প্রথমে ওটা পরীক্ষা করেন—রক্তটা ঠিক মত জীবাণুশূন্য (sterile) করা হয়েছে কিনা। তারপর দুধ ঘাঁটিয়ে নিয়ে যে ভাবে মাখন তোলা হয়, সেই ভাবে ঐ রক্তের কণিকা অংশটা (cellular) রক্তরস থেকে আলাদা করা হয়। এরপর রক্তরসটাকে আলাদা পাত্রে রাখে। কিন্তু রক্তরসকে আলাদা করে বের করবার আগে দেখা যাবে, ঘাষের হাল্‌কা রংয়ের মত এক রকম তরল জিনিস ঐ পাত্রের উপরে রয়েছে। আর তলায় রয়েছে ঘন লাল পেণ্টের মত এক রকম জিনিস। এইটাই প্রধানত রক্ত কণিকা।

তারপর তাঁরা ঐ রক্তরসকে একটা বায়ুশূন্য পাত্রে শূন্য ডিগ্রীরও নিম্নতাপে রেখে জমিয়ে নেন। এরপর ঐ জমাট-বাঁধা রক্তরসটা দেখতে গুড়ের দানার মত হয়ে যায়।

রক্ত যাঁরা দেন, তাঁদের কাছ থেকে কি ভাবে রক্ত নেওয়া হয় তাও বলা যাক্‌।

দেখা গেছে ইন্‌জেকসন দিতে হবে শুনলে অনেক রোগী প্রথম দিকে বেশ কিছুটা ভয় পান। কিন্তু দেওয়ার পর তাঁরাই বলেন, এটা ত' এমন কিছুই নয়!
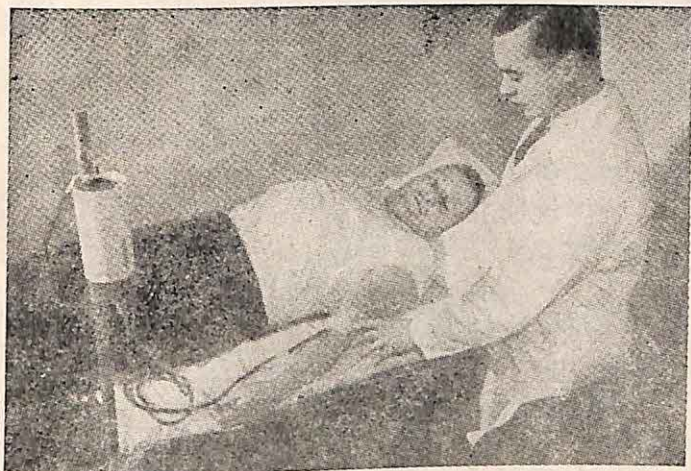
আহতের শরীরে রক্ত চালনা করা হচ্ছে।

যাঁরা কোনও ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে যান, তাঁদের অনেকে প্রথমটা কিছু ঘাবড়ে যে না যান এমন নয়। কিন্তু পরে তাঁরাও বলেন, এটা ত' কিছুই নয়! অবশ্য কেউ কেউ রক্ত দেওয়ার পর নিজেকে কিছুটা দুর্বল মনে করেন। ডাক্তারেরা বলেন, এটা স্নায়ুর দুর্বলতা বা মনের ভয় ছাড়া

আর কিছুই নয়। এরূপ লোককে গরম দুধ, কফি বা চা খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যাবেন। একবার রক্ত দেওয়ার পর আবার দু'মাস পরে রক্ত দেওয়া চলে। কিন্তু বছরে পাঁচ বারের বেশি রক্ত দেওয়া ঠিক নয়।

বিজ্ঞানীরা আজকাল রক্ত সংরক্ষণের নতুন নতুন উপায়ও আবিষ্কার করছেন। কেউ কেউ আবিষ্কার করেছেন গরুর গায়ের রক্তও মানুষের শরীরে ঢুকালে ফল পাওয়া যায়।

রাশিয়ার একজন বিচক্ষণ ডাক্তার মত দিয়েছেন, মরা মানুষের শরীর থেকেও রক্ত নেওয়া চলে। তবে মৃত্যুর দু'ঘণ্টার মধ্যে মৃতদেহ থেকে রক্ত নেওয়া চাই। তিনি বলেন, একজন পূর্ণবয়স্ক মরা মানুষের শরীর থেকে তিন লিটার পর্যন্ত রক্ত পাওয়া যেতে পারে। শরীরের রক্ত কমে যাওয়ায় যারা মারা যেতে পারেন, তাঁদের প্রাণ রক্ষার জন্য এই রক্ত কাজে লাগে।

চিকিৎসকেরা ওষুধপত্র দিয়ে বা অস্ত্রোপচার করে রোগীকে বাঁচান। তাঁরা মহৎ এবং ভাগ্যবান।

যাঁরা রক্ত দান করেন, অন্যকে জীবন দানের মহৎ সৌভাগ্য তাঁরাও লাভ করেন—সন্দেহ নেই।

কৃত্রিম রক্ত

ব্লাড-ব্যাঙ্কে বিভিন্ন গ্রুপের রক্ত সঞ্চয় করে রাখা হয়। মুমূর্ষু রোগীর দেহে সময় মতো এই রক্ত চালনা করে জীবন রক্ষা করা যায়।

কিন্তু এই ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্তটা ঠিক যে ভাবে দাতার দেহ থেকে নেওয়া হয় সেভাবে রাখা হয় না। শুক্‌নো গুঁড়ো অবস্থায় রাখা হয়। পরে ঐ শুক্‌নো গুঁড়ো রক্তের সাথে প্রয়োজন মতো ডিস্‌টিলড্‌ ওয়াটার মিশিয়ে সেটা রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। এই রক্ত দেওয়ার ব্যাপারে একটা জিনিস সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন। রক্তের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে। একে ব্লাড-গ্রুপ বলে। যেমন ধর, তোমার শরীরে আছে 'এ' গ্রুপের রক্ত, আমার 'বি' গ্রুপের, শ্যামের 'ও' গ্রুপের ইত্যাদি। রক্তকে আজ পর্যন্ত মোট তের শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব হয়েছে এবং আরও আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে। তোমার শরীরে 'বি' গ্রুপের রক্ত থাকলে বি গ্রুপ ছাড়া অন্য কোনও গ্রুপের রক্ত তোমায় দেওয়া চলবে না। ব্লাড ব্যাঙ্কের কাজ হ'ল বিভিন্ন লোকের শরীর থেকে বিভিন্ন গ্রুপের রক্ত নিয়ে সেটাকে শুক্‌নো করা এবং সময় মতো রোগীর দেহে যে গ্রুপের রক্ত লাগবে—সেটা দেওয়া। কিন্তু ধর, যদি ব্লাড-ব্যাঙ্ক কোন সময় ফেল হ'য়ে পড়ে, তখন কি উপায় হবে? আর এমনটা ত' হতেই পারে—কারণ দৈব দুর্বিপাকের কথা ত' আর বলা যায় না। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় একসঙ্গে বহু লোককে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সবাইকেই তো রক্ত দিতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে, নইলে বাঁচানো যাবে কি করে? তখন উপায়?

বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরে এ নিয়ে চিন্তা করছিলেন। রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামে একটা জিনিস আছে, যার কাজ হচ্ছে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা যখন শ্বাস নিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করি—তখন সেই অক্সিজেনকে হিমোগ্লোবিন শুষে নিয়ে শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়।

বিজ্ঞানীরা তাই খুঁজছিলেন এমন একটা জিনিস যেটা আসলে হিমোগ্লোবিনের মতই কাজ করবে অর্থাৎ অক্সিজেন শুষে নিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দেবে। আর সত্যি সত্যি এতদিনে তাঁরা সেই বস্তুটির সন্ধানও পেয়েছেন।

এই কৃত্রিম রক্ত আসলে একটি রাসায়নিক পদার্থ—যার নাম ফ্লুরো-

কার্বন। ফ্লুরিন ও কার্বনের সংমিশ্রণে এটা তৈরি হয়। এই ফ্লুরো-কার্বনের সাথে লবণ জল ও গ্লুকোজ মিশিয়ে তার মধ্যে আমাদের শ্রুতির সীমানার বাইরে এক উচ্চ পর্দার শব্দ-তরঙ্গ (আলট্রা সোনিক সাউণ্ড) পাঠানো হয়। এ শব্দ কানে শোনা যায় না কিন্তু এর অসীম ক্ষমতা। এই শব্দ-তরঙ্গ ফ্লুরো-কার্বনকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকায় বিভক্ত করে। এর ফলে মিশ্রণটির চেহারা হয় সাদা। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফ্লুরো-কার্বনগুলির আকৃতি হয় তখন লোহিত কণিকার আকৃতির এক দশমাংশ। আর এটাই হ'ল মানুষের তৈরি নকল রক্ত।

আমেরিকার মস্ত বড় বিজ্ঞানী লেলাণ্ড ক্লার্ক এই নকল রক্ত একটা কুকুরের শরীরে ঢুকিয়ে তাকে এক বছরেরও বেশি সময় বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

নকল রক্ত কিন্তু সরাসরি দেহের মধ্যে ঢুকানো হয় না। শরীরে ঢোকাবার আগে এই নকল রক্তের মধ্যে প্রচুর অক্সিজেন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নকল রক্তের ফ্লুরো-কার্বন তখন আসল রক্তের হিমোগ্লোবিনের মতো অক্সিজেন শুষে নিয়ে শরীরের বিভিন্ন টিস্যুতে পৌঁছে দেয়। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপারে এটা আসল রক্তের চেয়ে বেশি নিরাপদ। যেমন মনে কর, একজন লোকের ভীষণ একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়ে হাত কাটা গেছে। এক্ষুনি তাকে রক্ত দিতে হবে। ব্লাড-ব্যাঙ্কের রক্ত দেওয়ার আগে রোগীর শরীরে কোন্ গ্রুপের রক্ত আছে তা পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এক গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তের সাথে মেশালে মারাত্মক ফল হতে পারে। হাঁ, এমন অবস্থায় ডাক্তারবাবু এখন নির্বি-বাদে রোগীর শরীরে কৃত্রিম রক্ত ঢুকিয়ে দেবেন। কারণ এই রক্ত রোগীর দেহে চালনা করবার সময় ব্লাড-ম্যাচিং এর প্রয়োজন নেই।

অ্যাণ্টিবায়োটিক ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে বর্তমান যুগকে বলা যায় পরমাণু আর অ্যাণ্টিবায়োটিকের যুগ। এ্যাণ্টিবায়োটিক ওষুধগুলি বর্তমান শতাব্দীতে এক নতুন পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

'অ্যান্টি' কথাটির অর্থ—বিরুদ্ধে। আর বায়োটিক মানে জীবন।

বিজ্ঞানীরা এদের আলাদা ক'রে মানুষের দেহে যে সব জীবাণু যুদ্ধ করে তাদেরই বলা হয়েছে 'এ্যাণ্টিবায়োটিক'।

পৃথিবীতে অসংখ্য জীবাণু বসবাস করছে। তাদের মধ্যে সব সময়েই যুদ্ধ চলছে। বিভিন্ন জীবাণু তাদের নিজের শরীর থেকে নানারকম রাসায়নিক জিনিস তৈরি করে অন্য জীবাণুকে ধ্বংস করে অথবা তারা যাতে বাড়তে না পারে তা' করে।

বিজ্ঞানীরা এদের আলাদা ক'রে মানুষের দেহে যে সব জীবাণু ক্ষতি করে, তাদের ধ্বংস করবার জন্য এদের কাজে লাগান।

লুই পাস্তুর জীবাণুদের আবিষ্কার করেন আর ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং অ্যাণ্টিবায়োটিকের সাহায্যে শত্রু-জীবাণুদের ধ্বংসের পথ দেখান।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অতি আশ্চর্য ভাবে 'পেনিসিলিনের' দেখা পাওয়া গিয়েছিল।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং লণ্ডনের এক হাসপাতালে স্টেফাইলোকক্কাস নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই কক্কাস এক রকম দুরন্ত জীবাণু। এই জীবাণু আমাদের দেহে অনেক রকম রোগের সৃষ্টি করে।

ফ্লেমিং একদিন হঠাৎ দেখলেন, তাঁর গবেষণার বস্তু কক্কাসের উপরে সবুজ একটা ছাতা পড়েছে। বর্ষার ভিজে দিনে আমাদের জুতো জোড়া কয়েকদিন ব্যবহার না করে ফেলে রাখলে তার গায়ে যেমন সবুজ সবুজ গুঁড়ো মত ছাতা পড়ে—ঠিক তেমনি ঐ ছাতাটা।

ধুলো বাতাস জীবাণুতে ভরা। ফ্লেমিং বুঝলেন, বাতাস থেকে কি ভাবে ঐ ছাতার বীজ তাঁর কক্কাসের মধ্যে এসে পড়েছে। এটা সম্ভবতঃ তাঁর সহকারীর সাবধান না হওয়ার জন্যে হয়েছে। সহকারীকে তিনি এজন্য তিরস্কারও করলেন। ফ্লেমিং বিরক্ত হ'য়ে একটা চামচে করে ঐ সবুজ ছ্যাত্‌লাটা তুলে নিয়ে কক্কাস জীবাণুগুলিকে আলাদা জায়গায় সরিয়ে রাখলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। হঠাৎ ডাক্তার ফ্লেমিং-এর ঐ পুরোনো কক্কাসের বীজাণুগুলির দিকে চোখ পড়ল। অবাক কাণ্ড! যেখানে ঐ সবুজ ছ্যাত্‌লাটা পড়েছিল সেখানকার চারদিকের কক্কাস জীবাণুগুলি গলে গেছে! তিনি আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন—তবে কি ঐ সবুজ ময়লাটার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা মানুষের মহাশত্রু, ঐ কক্কাস জীবাণুর বৃদ্ধি ঠেকাতে পারে!

খোঁজ পড়ল সেই ময়লা ছ্যাত্‌লাটার ; সমস্ত মানুষ জাতির সৌভাগ্য বলতে হবে,—যে কোনো কারণেই হোক্ চামচেটা ধোওয়া হয়নি। ফ্লেমিং পরীক্ষা করে দেখলেন, ঐ সবুজ ময়লাটা 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম' নামে একটি ছাতা। ওর মধ্যেই রয়েছে একটি অদ্ভুত রাসায়নিক পদার্থ—যা অনেক রকম জীবাণুর বৃদ্ধি ঠেকাতে পারে।

সেটা ১৯২৯ সাল। রোগ সারাতে বস্তুটির অসাধারণ ক্ষমতা দেখে সারা জগতের লোক অবাক হ'য়ে গেল। ছাতাটির নাম করা হ'ল 'পেনিসিলিন।'

এই ধন্বন্তরী ওষুধ পেনিসিলিনকে হঠাৎ পেয়ে যাওয়ায় ডাক্তারদের কি সুবিধাই না হয়েছে! আজকাল এই পেনিসিলিন আমাদের যেন নিত্য সহচর। শরীর একটু খারাপ হ'ল, গলায় খুসখুস সুরু

হ'ল, ঘা ফোঁড়া বা ঐ রকম কোন রোগ হ'ল—অমনি কথাটি নেই, ডাক্তারবাবু এসে পেনিসিলিন ইন্‌জেকসন দিয়ে দেবেন। কেবল ছোটখাট অসুখই নয়—ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক অসুখেও পেনিসিলিন দেওয়া হ'চ্ছে।
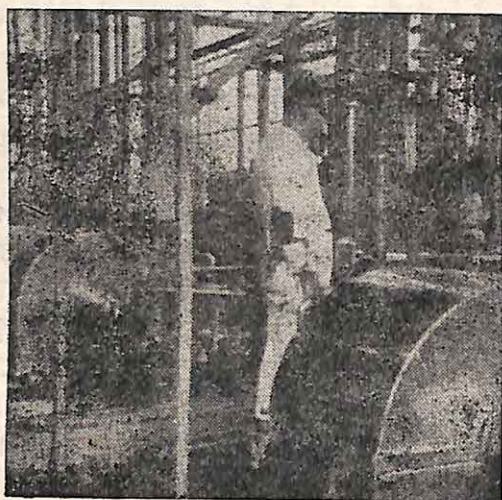
এ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন কারখানা

ইন্‌জেকসন ছাড়াও আজকাল মুখ দিয়ে পেনিসিলিনের বড়ি খাওয়ানো, ঘায়ে মলম লাগানো, কেটে গেলে ওর গুঁড়ো লাগিয়ে দেওয়া, কাশি হলে পেনিসিলিন লজেন্স চোষা—ইত্যাদি হরেক রকমে পেনিসিলিন ব্যবহারের রেওয়াজ হয়েছে। প্রথমে যখন পেনিসিলিনের আবিষ্কার হয় তখন এটি তৈরি করতে প্রচুর খরচ পড়ত। তাই এর দামও ছিল খুব বেশি। কিন্তু এখন ওটা বেশ সস্তায় তৈরি হচ্ছে। দামও কমে গেছে যথেষ্ট। আমাদের দেশে আগে পেনিসিলিন তৈরি হ'ত না। বিদেশ থেকে আমদানি করতে হ'ত। এখন আমাদের দেশেই যথেষ্ট পেনিসিলিন তৈরি হ'চ্ছে।

স্ট্রেপটোমাইসিন ঃ পেনিসিলিন ব্যবহার যেখানে অসুবিধা অথবা পেনিসিলিন যেখানে অকেজো হ'য়ে যায়, সেখানে স্ট্রেপটোমাইসিন নামে আর একটা অ্যাণ্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হ'চ্ছে আজকাল। কলেরা, টাইফয়েড, বিষাক্ত ঘা—এমন কি যক্ষ্মারোগেও এই ওষুধ ধন্বন্তরীর মত কাজ করছে।

পেনিসিলিনের আবিষ্কার হয়েছিল হঠাৎ, কিন্তু স্ট্রেপটোমাই-

সিনকে অনেকদিন ধরে কঠোর সাধনায় আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। এই ওষুধ যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি একজন আমেরিকান, তাঁর নাম ডাক্তার ওয়াকসম্যান। কি ক'রে এটা আবিষ্কার হ'ল তারও ইতিহাস আছে।

অনেকদিন আগের কথা। একদল বিজ্ঞানী রোগের জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা অনুমান করলেন, মানুষ মরে গেলে যখন তাকে মাটিতেই কবর দেওয়া হয়, তখন কবরখানার কাছাকাছি মাটিতে নিশ্চয়ই নানারকম বিষাক্ত রোগের জীবাণু পাওয়া যাবে। কারণ, বেশির ভাগ লোকই ত' মরে দুরন্ত ব্যাধি থেকে। তাহলে ঐসব ব্যাধির জীবাণু নিশ্চয়ই মৃতদেহ থেকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। সেখান থেকেই তা আবার মানুষের দেহে যায়।

কারখানায় এ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। উৎপাদনের সমস্ত প্রক্রিয়াও জীবাণুশূন্য অবস্থায় করা হয়ে থাকে।

গোরস্থানের মাটি পরীক্ষা করে কিন্তু ঐসব বিষাক্ত রোগের জীবাণু পাওয়া গেল না! তা'হলে জীবাণুগুলো গেল কোথায়? মৃত-দেহের মধ্যে যে সেগুলো ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার থেকে মাটিতেও সেগুলো ছড়িয়েছিল তাতেও বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ। তা হ'লে?

বিজ্ঞানীরা জানতেন, এমন কতকগুলি জীবাণু আছে যা অন্য জীবাণুদের ঘোরতর শত্রু। তাদের দেখতে পেলেই ওরা খেয়ে ফেলে। নিশ্চয়ই তাহলে মাটির মধ্যে এমন সব জীবাণু আছে যারা ঐ সব রোগের জীবাণুকে একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে। এরা তবে মানুষের বন্ধু। এইসব জীবাণুগুলোকে খুঁজে নিয়ে যদি তাই দিয়ে ওষুধ

বানানো যায়, তবে তা নিশ্চয়ই রোগীকে ঐ সব রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

তখন একদল বিজ্ঞানী লেগে গেলেন ঐ সব 'বন্ধু' জীবাণুদের খুঁজে বের করতে! ওয়াকসম্যান তাঁদেরই একজন।

এই খুঁজে বের করবার সাধনা বড় কম কথা নয়। দিনের পর দিন অসম্ভব ধৈর্য ও একাগ্রতা নিয়ে ওয়াকসম্যান তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইলেন। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন এমন একটা জীবাণুর সন্ধান পেলেন ওয়াকসম্যান যা বহু রকম রোগ-বীজাণু ধ্বংস করতে ওস্তাদ। তার নাম দিলেন তিনি 'স্ট্রেপটোমাইসিন্'। পেনিসিলিন দিয়ে যেখানে কোন কাজ হয়নি, স্ট্রেপটোমাইসিনে সেখানে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল।
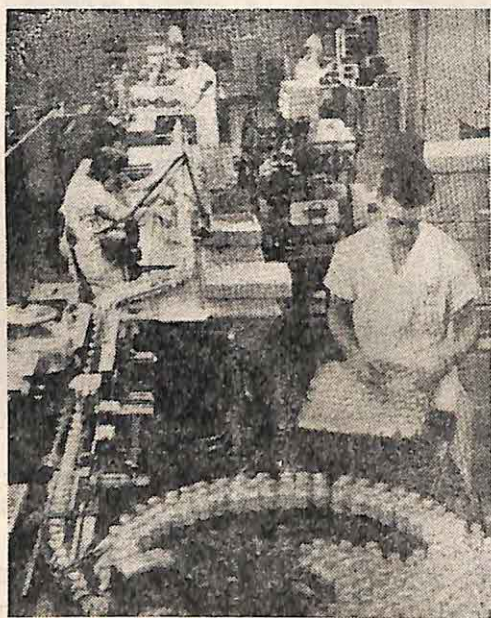
এ্যান্টিবায়োটিক তৈরির শেষ অবস্থা। শিশির মধ্যে ওষুধ ভর্তি হয়ে বেরিয়ে আসছে।

কান, নাক ও গলার চিকিৎসায়, টাইফয়েড, কলেরা, অন্ত্রের ভিতর কার ঘা, য়্যাপেণ্ডিসাইটিস—এমন কি যক্ষ্মা রোগেও এই স্ট্রেপটোমাইসিন অব্যর্থ। প্লেগ রোগে সালফাডায়াজিনের সঙ্গে স্ট্রেপটোমাইসিন মিশিয়ে ব্যবহার করলে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়।

১৯৫২ সালে এই ওষুধ আবিষ্কারের জন্য ওয়াকসম্যান নোবেল প্রাইজ পান।

এরপর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অ্যাণ্টিবায়োটিকের খোঁজে তৎপর হয়ে উঠলেন। আবিষ্কৃত হ'ল—অরিয়মাইসিন, টেরামাইসিন, নিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন—এইসব।

ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে অরিয়মাইসিনের ব্যবহার কার্যকর।

যে সব কঠিন রোগে অন্যান্য এ্যাণ্টিবায়োটিকে ফল হয় না, সেখানে টেরামাইসিন ব্যবহার করে ফল পাওয়া গেছে।

নিওমাইসিন বহু ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে পারে।

টাইফয়েড, হুপিং কাশি প্রভৃতিতে ক্লোরোমাইসেটিন ফলপ্রদ।
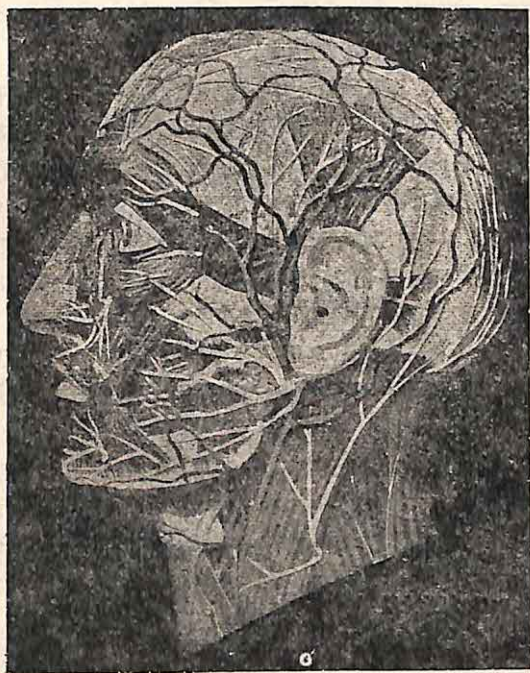
মস্তিষ্কে স্নায়ু জালের ছবি। সারা দেহে এই রকম স্নায়ুর সূক্ষ্ম জাল ছড়িয়ে আছে।

স্নায়ুজাল ও মগজের কথা ঃ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে তারের যে গোলকধাঁধা দেখা যায় তার চেয়ে ঢের বেশি জটিল হচ্ছে আমাদের স্নায়ুজাল। আমাদের সমস্ত দেহে স্নায়ুর এই সূক্ষ্ম জাল ছড়িয়ে আছে। এদের কাজও বিভিন্ন। কোন স্নায়ু অন্তর্মুখী কোনটি

বা বহির্মুখী। বাইরের অনুভূতিকে ভিতরে পাঠায় অন্তর্মুখী স্নায়ু আর মনের অনুভূতিকে বাইরে কাজ করায় বহির্মুখী স্নায়ু। শরীরের মাঝখানে আছে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া। তার মাঝখানে সুষুম্নাকাণ্ড—ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলা হয় স্পাইনাল কর্ড। স্নায়ুগুলো প্রায় সবই এসে মিশেছে ওখানে। এই সুষুম্নাকাণ্ড দিয়েই মগজের সঙ্গে শরীরের যোগাযোগ ঘটেছে।

আমরা আমাদের সংবাদগুলো দু' রকমে পাঠাতে পারি। একটি সময়সাপেক্ষ ডাক বিভাগ, অপরটি তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাফ বিভাগ। আমাদের দেহের মধ্যেও ঐ রকম দুটি বিভাগ আছে। রক্ত প্রবাহ ডাক বিভাগের চিঠিপত্র, পার্শেল প্রভৃতির মতো পরিপুষ্টি, অক্সিজেন প্রভৃতি সরবরাহ করে। আবার দেহের সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রটি টেলিগ্রাফ বিভাগের মতো। মগজের বিভিন্ন অংশ ও সুষুম্নাকাণ্ড এর হেড অফিস। দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এর শাখা অফিস। স্নায়ুগুলি উভয়ের সংযোগকারী তার।

যা কিছু আমরা অনুভব করি তার প্রায় সবই কোন না কোন স্নায়ুর ভিতর দিয়ে পেঁছে যাচ্ছে আমাদের মগজে। মগজ সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে নিয়ে ফের আবার তার সংকেত পাঠাচ্ছে স্নায়ুগুলিতে। পায়ে একটা কাঁটা ফুটল। সঙ্গে সঙ্গে তার সাড়া স্নায়ুর ভিতর দিয়ে মগজে পেঁছিল। মগজ অনুভব করল তার বেদনা, সংকেত পাঠাল স্নায়ুতে—পা-টা তুলে হাত দিয়ে কাঁটাটা টেনে বের কর। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, মনে হবে যে, পায়ের ভিতরেই বুঝি এত সব হয়ে গেল। না, কাঁটাটা পায়ে ফুটলেও ব্যথা পেয়েছে মগজে। কাঁটা বের করবার জল্‌দি হুকুমও সেখান থেকে আরজেন্ট টেলিগ্রাম হয়ে এসেছে!

আমাদের মাথার খুলিটি যেন একটা বাক্স। তার মধ্যে রয়েছে মগজ। এই মগজ বা ঘিলু জিনিসটা খুবই কোমল। এত কোমল যে মাথায় আঘাত করলে অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি আমরা। 'ওর মাথায় কিছু নেই বা ছেলেটির অংকে খুব মাথা'—এসব বলতে আমরা তার মগজের কথাই মনে করি।

সুকুমার রায়ের লেখা মজার কবিতাটা তোমরা নিশ্চয় পড়েছঃ

আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।

আজকালকার দিনে সব কিছুতেই ভেজাল। ঘিয়ে ভেজাল, তেলে ভেজাল, দুধে ভেজাল। তবু আমরা একরকম চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু

সাবধান—মগজের ঘিয়ে ভেজাল থাকলে আর রক্ষে নেই,—হাবাগোবা কি পাগল হয়ে যেতে হবে তখন। না, টেলিস্কোপ আছে, মাইক্রোস্কোপ আছে, স্টেথিসস্কোপ আছে কিন্তু 'ফ্যুটোস্কোপ' বলে এখনও কিছু বেরোয়নি।

মগজের গঠন: বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু পিণ্ডের সাহায্যে মগজটি তৈরি। এই স্নায়ু পিণ্ডগুলি রক্তবহনালী দিয়ে পূর্ণ। বাইরের থেকে এই মগজকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সামনের দিকটার অংশ, মাঝের অংশ আর পিছনের অংশ। বিজ্ঞানীরা এদের
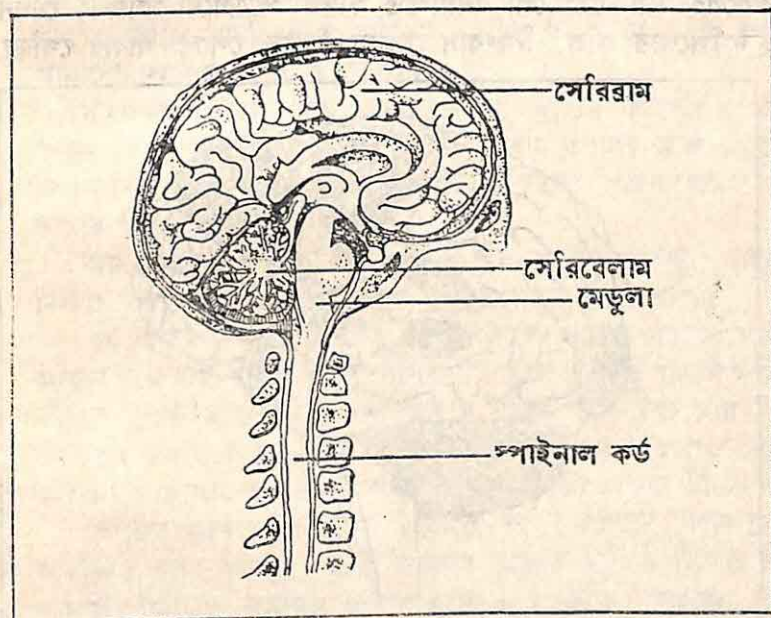
মানুষের সেনট্রাল নারভাস সিসটেম। পুরনো মগজ সেরিবেলামকে টুপির মতো ঢেকে ফেলেছে নতুন মগজ সেরিব্রাম। মেডুলাও মগজের একটা অংশ। মগজের বিভিন্ন অংশ থেকে বারো জোড়া স্নায়ু উৎপন্ন হ'য়ে স্পাইনাল কর্ড দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

নাম দিয়েছেন—মূল বা গুরু মস্তিষ্ক (সেরিব্রাম), লঘু মস্তিষ্ক (সেরিবেলাম), আর আয়ত মজ্জা বা সুষুম্নাশীর্ষক (মেডুলা অবলঙ্গেটা)। সামনের দিকটার মগজের উপর হচ্ছে মগজের সবচেয়ে প্রধান অংশ। এটাকে নতুন মগজও বলতে পারো। বাকী অংশটা পুরোনো মগজ। তোমরা বোধহয় ভাবছ মগজের আবার নতুন পুরোনো কি? সব মগজটা নিয়েই ত আমরা জন্মাই। হাঁ, তা জন্মাই বটে, কিন্তু ওর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। জলচর, উভচর,

পাখী এদের পর যখন স্তন্যপায়ী জীব দেখা দিল তখনই আস্তে আস্তে নতুন মগজের চিহ্ন দেখা গেল। তারপর বানরের মগজে এবং সবশেষে সভ্যতম মানুষের মগজে দেখা গেল, পুরোনো মগজকে টুপীর মতো ঢেকে ফেলেছে এই নতুন মগজ। সৃষ্টির গোড়ার দিকে এ ধরনের মগজ ছিল না। তাই এটার নাম দেওয়া হয়েছে নতুন মগজ। মানুষ যে অতি বুদ্ধিমান তার কারণই হচ্ছে ঐ নতুন মগজ।

পুরোনো আর নতুন মগজের কোন্‌টার কি কাজ তাও পণ্ডিতেরা ধরে ফেলেছেন। আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে যে কাজগুলো না করলেই নয়—সেগুলো নিয়ন্ত্রিত করছে পুরোনো মগজ। যেমন হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ, নিঃশ্বাস নেওয়া, ক্ষিদে পেলে খাবার খোঁজা,
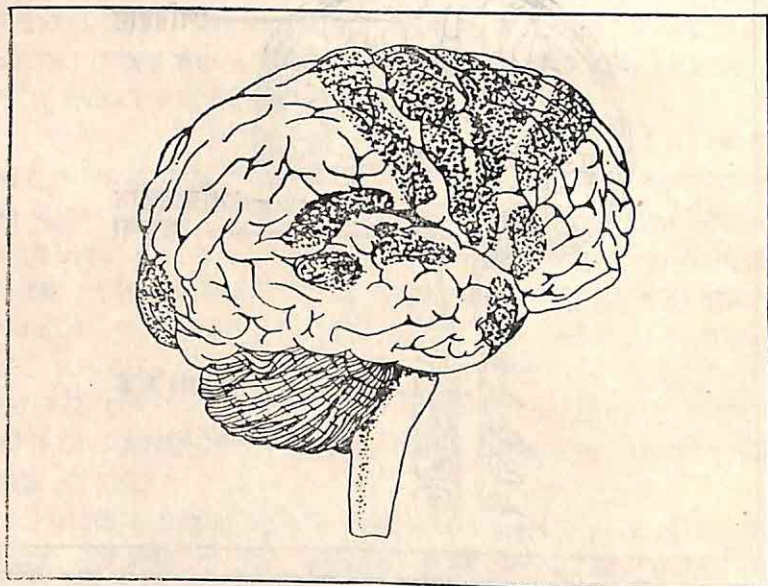
আমাদের মগজের সেরিব্রামের ছবি। কালো ফোঁটা চিহ্নিত স্থানের কোনও অংশের জন্য পাই আমরা আস্বাদ, কোনটিতে পাই গন্ধ, কোনটির জন্য আবার দেখতে পাই। কোনও কোনও কালো ফোঁটা চিহ্নিত স্থানের জন্য আমরা আমাদের চোখকে এদিক ওদিক ঘুরাতে পারি, চোখ খুলতে ও বুজতে পারি, শুনতে পারি, কথা বলতে পারি। মগজের এ বস্তুটি না থাকলে কি ব্যাপার হতো ভাবতে পারো ?

হাঁটা, বসা, শোয়া এইসব। সব প্রাণীই এগুলি করে। কিন্তু উঁচু দরের কিছু চিন্তা করতে গেলে চাই নতুন মগজ। একটা মাছ কি পাখী চিন্তা করতে পারে? কবিতা লিখতে পারে?—কখনই না। কারণ তাদের নতুন মগজ নেই।

মনের কি ভালোবাসার কথা বলতে গেলে আমরা বুকে হাত দিয়ে

দেখাই। ভাবটা যেন—মন? ওতো হৃদয়ের ব্যাপার। বুকের মধ্যেই ওর স্থান। আসলে কিন্তু মন মগজেরই একটা ব্যাপার—মগজই তাকে চালাচ্ছে। ভয় পেলে বা উত্তেজিত হলে বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে ঠিকই। কিন্তু তাই বলে মনে আঘাত মানে হৃদ্‌পিণ্ডে আঘাত নয়।

মগজের ভিতরের অংশ শ্বেতস্নায়ু মজ্জা দিয়ে পূর্ণ। ওর উপরে একটা ধূসর রংয়ের স্নায়ু মজ্জার স্তর আছে। এটা ঐ শ্বেত স্নায়ু মজ্জাকে টুপীর মতো চারদিকে ঘিরে আছে। এটাই নতুন মগজ। এর স্তরের গাঢ়তার উপর মগজের শক্তির কম-বেশি নির্ভর করে। অন্যান্য প্রাণীর মগজে মানুষের মগজের মত ভাঁজ থাকে না। এই মগজই আমাদের স্মৃতি শক্তির মূলাধার।

মূল মগজ (সেরিব্রাম) আমাদের ভ্রূ দুটির কাছাকাছি এসে পিছন দিকে গিয়েছে। ক্ষুদ্র মগজটা (সেরিবেলাম) মূল মগজের পিছন দিকে ঠিক ঘাড়ের উপর অর্থাৎ এক কানের পিছন থেকে অপর কানের পিছন পর্যন্ত ছড়ানো।

আয়ত মজ্জা বা সুষুম্নাশীর্ষকের (মেডুলা অবলঙ্গেটা) বাইরের দিকটা সাদা এবং ভিতরটা ধূসর রংয়ের স্নায়ু দিয়ে ভরা।

এই আয়ত মজ্জার উপরের দিকের অংশে আঘাত লাগলে আমরা অজ্ঞান হয়ে যাই, যদিও তখন শ্বাসপ্রশ্বাস চলে। কিন্তু যদি ঐ মজ্জার নীচের দিকে আঘাত লাগে তাহলে হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃত্যু হয়। এইজন্য খেলার ছলেও কখনও কারও মাথায় আঘাত করা বা অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি দেওয়া উচিত নয়।

মগজের গঠন অতি জটিল। এটাকে সর্বদা বাইরের বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখা দরকার। তাই মগজকে মাথার খুলির ভিতর রাখা হয়েছে। দিনরাত অসম্ভব খাটতে হচ্ছে এ মগজকে। সেইজন্য মাঝে মাঝে এর বিশ্রাম প্রয়োজন। ঘুমই হচ্ছে মগজের বিশ্রাম।

মগজে নিউক্লিয়ার অস্ত্রোপচার

আমাদের মগজের নীচে রয়েছে মটরের দানার মত দেখতে পিটুইটারী গ্ল্যান্ড। এই পিটুইটারী গ্ল্যান্ড থেকে নানারকম হরমোন নিঃসৃত হয়। এরাই মানবদেহের প্রায় সকল রকম কার্য প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করে। পিটুইটারী গ্ল্যান্ডে টিউমার হলে সেখান থেকে অতিমাত্রায় শরীরের প্রয়োজনীয় হরমোন নিঃসৃত হতে থাকে। তার ফলে ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। হাত-পা-মুখ স্থূল ও কর্কশ হয়ে পড়ে।

এতদিন পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা পিটুইটারী গ্ল্যান্ডের মারাত্মক এই রোগে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার চালিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে এইচ লরেন্স এর এক অভিনব ও আশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। একটি নিউক্লিয়ার যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা রশ্মিকে এই ধরনের রোগীর মাথার পিটুইটারী গ্ল্যান্ডে ফোকাস করা হয়। সাইক্লোট্রোন থেকে নির্গত এই রশ্মি পিটুইটারী গ্ল্যান্ডের টিউমারকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। এই নিউক্লিয়ার ব্রেন সার্জারীতে মগজের রোগগ্রস্ত জায়গা ছাড়া তার ধারেকাছের অন্য টিস্যুর কোন ক্ষতি হয় না।

স্মৃতি-কণিকাঃ কারো মেধা ও স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ন হলে আমরা তাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে থাকি। অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মেছেন। অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরও অনেক সময় দেখা গেছে, তাঁদের স্মরণশক্তি প্রখর নয়। প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। প্রতিভার ব্যাপারটা অবশ্য এখনও অনেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করলেও স্মরণশক্তিকে তাঁরা সেরূপ কিছু মনে করেন না।

কোনও কিছু স্মরণ করবার আগে সুস্পষ্ট তিনটি ঘটনা ঘটে। প্রথমে মস্তিষ্কে তথ্যটা ঢোকে, সেখানে সেটা জমা হয় এবং পরে সেটা মনে পড়ে। এই ঘটনাগুলি পর পর ঘটে যায়, যদিও কেমন করে ঘটে. তা সুস্পষ্ট নয়। মাত্র কিছুদিন আগেও ধারণা ছিল, স্মরণের তথ্যগুলি বৈদ্যুতিক উপায়ে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়।

মানুষের মগজকে অনেকটা কম্পিউটার মেসিনের সঙ্গে তুলনা

করা চলে। হিসেব করে দেখা গেছে, একটা মানুষের স্মরণশক্তিকে কম্পিউটারে ধরে রাখতে গেলে যতটা ম্যাগ্নেটিক টেপ লাগবে, তার পরিমাপ সারা পৃথিবীর পরিমাপের সমান।

মস্তিষ্কের এই স্মরণশক্তিকে পরিষ্কার করে বোঝবার জন্যে তামাম দুনিয়ায় বড় বড় মস্তিষ্ক কাজ করে চলছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে একটি রাসায়নিক ঘটনা এবং এর স্বপক্ষে তাদের যথেষ্ট যুক্তিও আছে।

স্মৃতিশক্তিকে ধরে রাখে যে সব রাসায়নিক পদার্থ, তাদের আশ্চর্য উপায়ে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ক থেকে কেবল পৃথকই করেননি—কৃত্রিম উপায়ে এদের গবেষণাগারে উৎপাদন করতেও সক্ষম হয়েছেন।

একোলাইন-২০ঃ কারখানার লেদ মেসিনে—টার্নিং বা থ্রেড কাটিং করতে গেলে সাবধান না হলে অনেক সময় লোহার খুব ছোট টুকরো চোখের মধ্যে ঢুকে যায়। চোখটা খচ্ খচ্ করতে থাকে তখন। এটাকে বের করতে হলে চিকিৎসক চুম্বকের সাহায্য নিয়ে থাকেন। যারা ছাতি মেরামত করে, তাদের কাছেও চুম্বক খণ্ড থাকে। সূঁচটা হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করে ঐ চুম্বক দিয়ে। চুম্বকের কাজই হচ্ছে লোহাকে টেনে নিয়ে আসা।

কিন্তু ঐ চুম্বক কেবল লোহাকেই টানে,—আর কোন ধাতুকে টানে না। কারখানায় পিতলের রড নিয়েও কাজ করা হয়। এই পিতলের একটা টুক্রো যদি চোখে গিয়ে পড়ে, তাহ'লে তাকে কি করে বের করা যাবে?

ভাববার কথা।

অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি নিয়ে চোখের মধ্যে এলোমেলো ভাবে যদি সেটির সন্ধান করা যায়, তাহ'লে চোখটি নষ্ট হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

তোমরা বলবে,—এক্স-রে দিয়ে টুক্রোটা কোথায় আছে জেনে নিয়ে তারপর বের করলেই হয়।

হাঁ, তা হতে পারে কিন্তু তাতে অসুবিধাও আছে। এক্স-রে দিয়ে খুঁজবার সময় চোখের মণি ঘোরাফেরার জন্য ঐ পিতলের টুকরো-টার জায়গা বদল হ'তে পারে। তখন ঠিক ওটা কোথায় ধরা যাবে না।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্য আজকাল একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দাঁতের চিকিৎসা যাঁরা করেন, তাঁদের 'ড্রিল' যন্ত্রের চেয়ে আকারে ছোট এবং তার চেয়েও সূক্ষ্ম এই যন্ত্র। ধানের হুলের মত খুব সরু একটা হুল বেরিয়ে থাকে একটা ছোট্ট চিমটের বাহু দুটির মাঝখান থেকে। ওর থেকে পাওয়া যায় আমাদের শুনবার

শক্তির বাইরে এক উঁচু পর্দার শব্দের ঢেউ। এর নাম—'সুপারসনিক' বা 'আলট্রাসনিক' শব্দ। এই শব্দ শোনা যায় না। শব্দ-তরঙ্গের প্রতিধ্বনি চোখের ভিতর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে ঐ যন্ত্রের উপর আঘাত করে। আর একটা যন্ত্রে ওর ছবি ফুটে ওঠে। এই ছবির সাহায্যে চোখের ভিতরে যন্ত্রটি ঢুকিয়ে দিয়ে চিমটির সাহায্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পিতলের টুকরোটি বের করে নিয়ে আসা যায়। এই যন্ত্রটির নাম—'একোলাইন-২০'।

লেসার রশ্মিঃ সাধারণ যে বিদ্যুতের আলো বাল্‌ব থেকে ছড়িয়ে পড়ে—সে আলোতে থাকে নানা মাপের তরঙ্গ। সেই নানা মাপের আলোর তরঙ্গ কোনও একটি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

লেসার রশ্মির বেলায় কিন্তু তা হয় না। এই রশ্মির সুতীক্ষ্ন ছটা খুব তীব্র এবং সেটা বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। অস্ত্র চিকিৎসা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই রশ্মির ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৬০ সালে আমেরিকার গবেষণাগারে এই রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। তারপর থেকে নানা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখা দিয়েছে। অন্ধেরা এই রশ্মির সাহায্যে দৃষ্টি ফিরে পায়। এই রশ্মিতে একটি খুব ছোট প্লেট অন্ধের মাথায় রাখা হয়। এতে বাইরের দৃশ্যের ছায়া পড়ে মস্তিষ্কে। অন্ধেরা তাতে দেখতে পান। চোখের অস্ত্রোপচারে ছিঁড়ে যাওয়া 'রেটিনা'-কে আবার লেসার রশ্মির সাহায্যে জোড়া দেওয়া হ'চ্ছে। চামড়ায় ক্যানসার হলে তার অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য রোগের রক্তপাত ও অস্ত্রোপচারকে আজকাল বেদনাহীন করা হচ্ছে এই রশ্মির সাহায্যে। দাঁতের চিকিৎসাতেও লেসার রশ্মি ব্যবহারে খুব ফল পাওয়া যায়।

সমুদ্র থেকে ওষুধঃ এতদিন পর্যন্ত আমরা রোগ নিরাময়ের জন্য গাছপালা, বিভিন্ন উদ্ভিদ, ছত্রাক প্রভৃতি থেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করেছি। কিন্তু গাছপালা ত' কেবলমাত্র মাটির উপরই জন্মায় না—জলের নীচেও যে অসংখ্য গাছগাছড়া লুকিয়ে আছে তার খবর আমরা ক'জন রাখি? সারা দুনিয়ার শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ জলে ঢাকা—আর তার নীচে রয়েছে হাজার রকমের বিচিত্র সব উদ্ভিদ। আমাদের প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ 'চরকসংহিতা'য় সামুদ্রিক জীবজন্তু থেকে মূল্যবান ওষুধ তৈরির উল্লেখ আছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা সমুদ্র থেকে নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছেন।

আজ পর্যন্ত সমুদ্রের নীচে যত গাছগাছড়া আছে তার মাত্র এক ভাগ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তার থেকে পাওয়া গিয়েছে—অ্যাণ্টি-বায়োটিক, প্রচুর ভিটামিন ও আরও অনেক ওষুধ। 'সেফালোথিন'

নামে যে অ্যান্টিবায়োটিকটি পাওয়া গেছে সাগরের নীচে, তার কার্যক্ষমতা সাধারণ পেনিসিলিনের মতই। উদ্ভিদ ছাড়া সমুদ্রে আছে নানা ধরনের অদ্ভুত সব জীবজন্তু। তাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের দরকারী অনেক রাসায়নিক বস্তু। স্টার মাছ সম্প্রদায়ের দেহে পাওয়া গেছে টিউমার রোধ করবার ক্ষমতাযুক্ত আশ্চর্য ওষুধ। বিভিন্ন সরীসৃপ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন সব জিনিস যা নাকি সেনট্রাল নারভাস সিসটেমকে সঞ্জীবিত করতে পারে। 'আর্থোপোডা' জাতের জন্তুর দেহ থেকে পাওয়া গিয়েছে হৃদযন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অতি শক্তিশালী ওষুধ। এই ওষুধগুলো দিয়ে হৃদস্পন্দন খুশিমত কমান ও বাড়ান চলবে। অনেক সামুদ্রিক মাছের দেহে রয়েছে কিছু মূল্যবান হর্মোন। এই হর্মোনগুলো নাকি থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের রোগের এক আশ্চর্য ওষুধ।

প্রস্টাগ্লাণ্ডিনস্ঃ প্রায়ই দেখা যায় কতকগুলি ওষুধ আমাদের দুঃখ দুর্দশাকে দূর করতে আসে ভগবানের আশীর্বাদের মতো। যেমন সালফা ড্রাগস, পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন প্রভৃতি। এদের কয়েকটি আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হলেও—বেশির ভাগ ওষুধই তৈরি করতে লেগেছে বিজ্ঞানীদের বহু বৎসরের কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণা। প্রস্টাগ্লাণ্ডিনস্ হল সেই রকম একটা আশ্চর্য ওষুধ—যা ভবিষ্যতে আমাদের বহু রোগের যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেবে।

প্রস্টাগ্লাণ্ডিনস্ কেবলমাত্র একটি যৌগিক পদার্থ নয়। এরা হচ্ছে একই পরিবারভুক্ত অনেকগুলি বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু। সাধারণত এদের শরীরের সমস্ত টিসু বা স্নায়ুমন্ডলীতেই পাওয়া যায়। আমাদের মগজে, ফুসফুসে, কিডনী ও চোখের মধ্যেও এই রাসায়নিক বস্তুগুলি রয়েছে। ভন ইউলার নামে এক বিজ্ঞানী—প্রস্টেট্ট গ্রন্থি (আমাদের মূত্রাশয়ের নীচে থাকে) থেকে এদের প্রথম নিষ্কাষণ করেছিলেন বলে এরা প্রস্টাগ্লাণ্ডিনস্ নামে পরিচিত। আজ পর্যন্ত চৌদ্দটি বিভিন্ন প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিনস্ পাওয়া গেছে এবং তাদের কতকগুলোকে লেবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণও করা হয়েছে।

প্রস্টাগ্লাণ্ডিনস্ বহুরকম চিকিৎসায় সুফল এনে দিচ্ছে। অনেক সময় বাতাস ফুসফুসের মধ্যে ঠিকমতো চলাচল করতে পারে না। প্রস্টাগ্লাণ্ডিন ফুসফুসের বন্ধ রাস্তা খুলে দিয়ে বাতাস ঢুকবার পথ করে দেয়। বিজ্ঞানীরা আরও আশা করছেন দুরারোগ্য এ্যাজমা চিকিৎসায় এবং সাধারণ ঠাণ্ডায় নাকের অভ্যন্তরের জটবাঁধা পথকে প্রস্টাগ্লাণ্ডিন আশ্চর্য উপায়ে সারিয়ে তুলবে।

প্রস্টাগ্লাণ্ডিন গ্যাসট্রিক ও বাইলারী ধারাকে ঠিকপথে পরিচালিত

করে। এর ফলে যেখানে সেখানে ঘা হতে পারে না।

ওষুধের মধ্যেও অনেক ভালোমন্দ আছে। যে ওষুধ ব্যবহার করলে সবচেয়ে কম প্রতিক্রিয়া হবে সেটাই ভালো ওষুধ। প্রস্টা-গ্লাণ্ডিনস্ দেহকোষে শোষিত হয় না এবং তাড়াতাড়ি ভেঙে গিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে বলে এটা প্রথম শ্রেণীর আদর্শ ওষুধ হিসাবে স্থান পেয়েছে।

প্লাসটিক সার্জারীর যাদু

প্লাসটিকের নানারকম খেলনা, প্লাসটিকের গামলা-বালতি গেলাস—আরও কত কি আমরা দেখতে পাই। প্লাসটিক সার্জারী বলতেও আনাড়ী লোকে ভাববে, এটাও বুঝি অস্ত্রোপচার ক'রে প্লাসটিক জুড়ে দেওয়া।

না, তা নয়। প্লাসটিক পাত যদি কোনও ক্ষতস্থানে জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা জ্যান্ত হবে কি করে? প্লাসটিকের পাতে তো আর টিস্যু বা স্নায়ুমণ্ডলী নেই! রক্তধারা বইবে কিসের ভিতর দিয়ে? রক্ত চলাচল না করলে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই কাজ হয় না।

একটা যন্ত্র আর কোন জীবদেহের মধ্যে বড় পার্থক্য এই যে, যন্ত্রের কোনও জায়গা ক্ষয়ে গেলে, ফেটে গেলে কি ভেঙে গেলে যন্ত্রটা তা নিজে পরিপূরণ করতে পারে না। কিন্তু জীবদেহ তা পারে। আমাদের হাত-পা কেটে গেলে নিজের থেকেই সে কাটা জায়গা ভালো হয়ে যায়। গাছের গায়েও কোনও অস্ত্র দিয়ে ক্ষত করলে ঐ ক্ষতটা সে কিছুদিনের মধ্যেই পূরণ করে নেয়।

গাছের ছালের মধ্যে আঁশ থাকে এবং আঁশের ভিতর দিয়ে সে রস টেনে নেয়—ওটা যেন রক্তরস। আম, লেবু, কুল, গোলাপ প্রভৃতি গাছে জোড়-কলম করতে আমরা অনেকেই দেখেছি। একটা ডালের খানিকটা জায়গা থেকে ছাল তুলে নিয়ে আর একটা গাছের ডালেরও অনুরূপ ছাল তুলে একসঙ্গে বেঁধে রাখলে ওদের এক হয়ে জোড় বাঁধে।

আমাদেরও চামড়ায় আছে স্নায়ুমণ্ডলী, তার নীচে চর্বি। কোথাও কেটে গেলে চামড়ার এইসব রক্তবহা স্নায়ুমণ্ডলী ঐ জায়গাটা পূরণ করতে ব্যস্ত হয়। যেখানকার চামড়া কোনও কারণে বেশ খানিকটা নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে দেহের অন্য জায়গা থেকে জীবন্ত রক্তবহা স্নায়ুযুক্ত চামড়া এনে সুকৌশলে লাগিয়ে দিলে সেখানে ওটা জোড় লেগে যাবে। অস্ত্রবিদ্যার এই কৌশলটাই প্লাসটিক সার্জারী।

প্লাসটিক সার্জারীর আবিষ্কার হয়েছে খুব অল্পদিন আগে। কিন্তু এই চিকিৎসাতেও আমাদের স্মরণ করতে হবে অতি প্রাচীন-কালের ভারতীয় প্রখ্যাত চিকিৎসক সুশ্রুতের কথা। খ্রীষ্টজন্মের দুশো বছর আগে তিনি কপাল থেকে চামড়ার ফালি (Flap) তুলে নিয়ে নাক প্রভৃতির অস্ত্রোপচারের জায়গায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে

আনতে 'জোড়' (Graft) লাগাবার কৌশলের কথা বলে গেছেন।

কোন দুর্ঘটনায় পুড়ে যাওয়ায়, কেটে যাওয়ায় বা কুষ্ঠরোগ প্রভৃতিতে মানুষের শরীরে এমন সব ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়—যার জন্য লোকসমাজে তার মুখ দেখাতে লজ্জা করে।
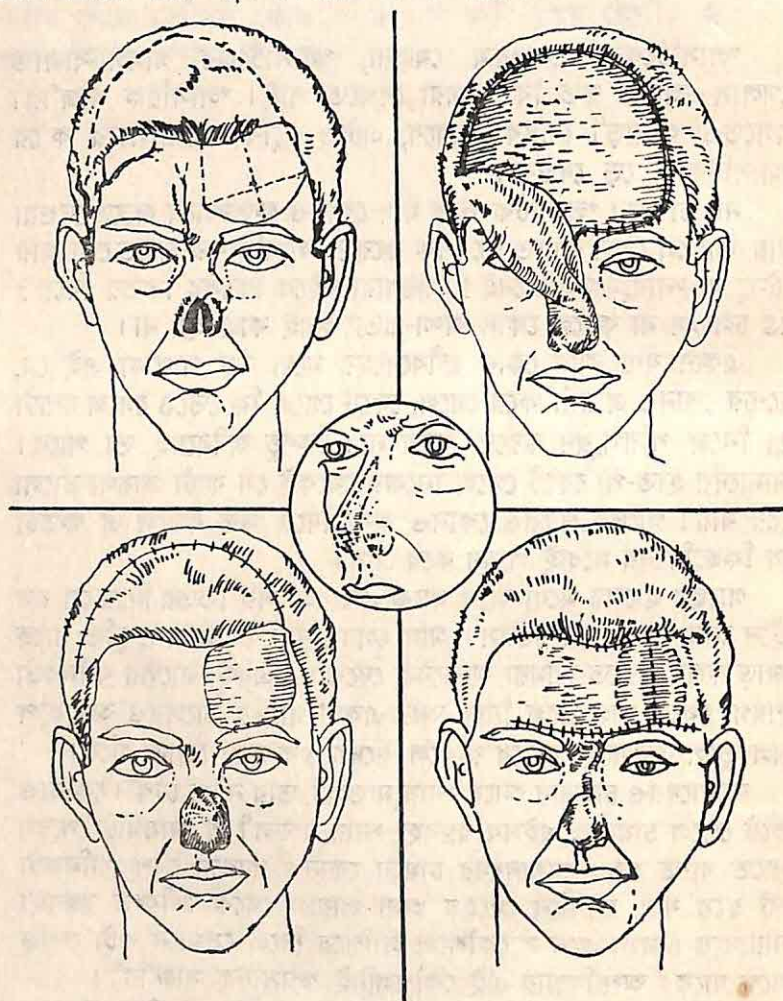
পর পর প্লাসটিক সার্জারীর সাহায্যে কপাল থেকে চামড়া নিয়ে কি ভাবে ক্ষত নাককে পূর্ণাবয়ব ও সুন্দর করা হয়, ছবিতে তা দেখানো হ'চ্ছে।

আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়গুলি কেবল যে নিজের নিজের কাজই করে যায় তা নয়। সৌন্দর্যও সৃষ্টি করে তারা। চোখ দিয়ে

আমরা দেখি, আবার তেমনি চোখকেও দাঁড়িয়ে দেখে লোকে। টানা চোখ, হরিণের মত চোখ, পটল চেরা চোখ সৌন্দর্য আনে মুখের। নাক আমাদের গন্ধ জানায়। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। তিল ফুল জিনি নাসা, বাঁশীর মত নাক, রোমান নোজ, উন্নত নাসিকাও মুখের সৌন্দর্য বাড়ায়।

অন্যদিকে চোখ দুটো যদি দেখতে কদর্য হয়, সুন্দর নাকের জায়গায় যদি একটা গর্ত কি ছিদ্রওয়ালা একটা মাংসপিণ্ড হয়, কান দুটো যদি দলাপাকানো হয়, ওষ্ঠটা যদি নাকের নীচে থেকে দু'ভাগ হয়ে যায়—তাহলে মুখখানা কেমন হয় দেখতে!

দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও কারণে এমন কদর্য মুখ হ'য়েছে যাদের—তারা কারও সামনে আসতে লজ্জা বোধ করবে।

প্লাসটিক সার্জারী এইসব হতভাগ্যদের জীবনে এনে দেবে আশার আলো। এই সার্জারী যে কেবল নাক কানের কাজের ক্ষমতাই ফিরিয়ে দেবে তাই নয়—তাদের সৌন্দর্যও ফিরিয়ে এনে মুখাকৃতি পালটে দেবে।
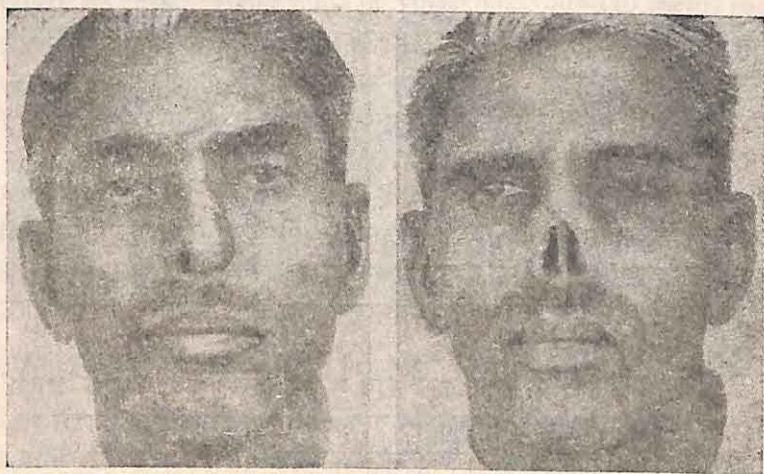
ডানদিকে—দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির ক্ষত নাক প্লাসটিক সার্জারীর আগে ; বাঁদিকে—প্লাসটিক সার্জারীর পরে।

যে সব শিশু তাদের উপর-ওষ্ঠকাটা অবস্থায় জন্ম নেয়, অল্প বয়সে তাদের প্লাসটিক সার্জারী করলে, বড় হলে কিছুমাত্র ধরা যাবে না যে এককালে তাদের ঠোঁট কাটা ছিল।

আধুনিক যানবাহনের জোর ছোটাছুটির জন্যে পথ দুর্ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কলকারখানায় মেসিনের কাজেও হাত বা

আঙ্গুল কম কাটা পড়ে না। এইভাবে আহত ব্যক্তি বেঁচে যেতে পারে, ক্ষতস্থানও ওষুধের সাহায্যে ভালো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ঐ আহত-স্থানের কিছুটা হানি হবেই। প্রথম দিকেই যদি এজন্য প্লাসটিক সার্জারীর সাহায্য নেওয়া যায় তাহলে ঐ জায়গার কদর্যভাবটা ঢেকে দেওয়া যাবে। পুড়ে যাওয়ার কথাও উপেক্ষা করার নয়। পুড়ে গেলে যে দাগ হয় সেটাও দেখতে খারাপ। প্লাসটিক সার্জারী সেখানকার আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

মুখে ক্যানসার একটা সাংঘাতিক ব্যাধি। অস্ত্রোপচার করার পর এই মুখ দেখতে খারাপ লাগে। কিন্তু প্লাসটিক সার্জারীতে মুখের অবয়বটা প্রায় আগের মত হয়েই ফিরে আসে। কুষ্ঠরোগে পরিণামে রোগগ্রস্ত জায়গার শিরাগুলির ক্ষতি হয়ে যায়। তার ফলে ঐ সব জায়গার পেশীগুলি যায় অসাড় হ'য়ে। প্লাসটিক সার্জারী এই ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কার্যকরী করে তোলে।

প্লাসটিক সার্জারী সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে আগে থেকে কয়েকটি শব্দের অর্থ পরিষ্কার ভাবে জেনে রাখা দরকার। সেগুলি এইঃ টিসু (Tissue)—শিরাজাল বা স্নায়ুমণ্ডলী। গ্রাফট (Graft) জোড়, একটা বস্তুর সঙ্গে আর একটা বস্তু শক্ত করে লাগানো। ফ্ল্যাপ (Flap)—রক্ত চলাচল করছে এমন স্নায়ুসহ চর্বিযুক্ত চামড়ার পাত। সেল (Cell)—রক্তকোষ। মোল্ডিং—ঢালাই। চামড়ার বেলায় মাপে মাপে বসিয়ে জোড় লাগানো।

প্লাসটিকের অর্থ হচ্ছে ঢালাই করে তৈরী। টিসুগুলিকে যখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নেওয়া হয়, তখন যেখানে ওটা লাগানো হবে সেখানটার ধারেকাছের টিসুগুলিকে এগিয়ে নিয়ে ও তুলে আনা টিসুমণ্ডলীকে মাপমতো কেটে (মোল্ডিং) সেখানে বসানো সম্ভব।

প্লাসটিক সার্জারীর ডাক্তার খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, ভালো 'ফ্ল্যাপ' এবং তাঁর নৈপুণ্য প্রয়োগ করেন—যার ফলে যন্ত্রোপচারের দাগটা যত-দূর সম্ভব মিলিয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি অস্ত্রো-পচারের চিহ্ন—সে যতই সরু হোক না কেন, তার একটা দাগ থাকবেই। এই দাগগুলিকে চুলের নীচেয়, কানের পিছন দিকে—যেখানটা হঠাৎ চোখে পড়ে না, সম্ভবমত এমন সব জায়গাতেই রাখা হয়। এভাবে সম্ভব না হলে দেহের স্বাভাবিক ভাঁজে ঐ দাগ ফেলা হয়। যে সব জায়গায় এত বেশি টিসুর ক্ষতি হয় যে, ঐ জায়গার টিসু দিয়ে নতুন চামড়া তৈরি সম্ভব নয়, সেখানে 'গ্রাফটের' আকারে দূর থেকে টিসু-যুক্ত চামড়ার আমদানী করতে হয়। চামড়া ছাড়াও চর্বি, হাড়, শিরা প্রভৃতিও জায়গা বিশেষে ব্যবহার করা চলে। চর্বির গ্রাফট নেওয়া হয়

চিবুকের কোন গর্ত পূরণ করবার জন্য। কানকে নতুন করে তৈরির জন্যে উপাস্থির (cartilage) গ্রাফ্‌ট আর চোয়ালের কিছু সংশোধনের জন্য হাড়ের গ্রাফ্‌ট দরকার হয়।

যখন জ্যান্ত টিস্যু দেহের এক অংশ থেকে অন্য অংশে লাগানো হয়, তখন ঐ টিস্যুর সেলগুলিকে রক্ষা করা দরকার। দাপনা থেকে নেওয়া পাতলা চামড়ার গ্রাফ্‌ট পুড়ে যাওয়া জায়গায় লাগানো চলে। একটা অস্ত্রোপচারেই এটা করা যায়। গ্রাফট যতক্ষণ না লাগানো জায়গা থেকে স্থায়ী রক্ত-সংযোগ পায়, ততক্ষণ ওটা ক্ষতস্থানের ছিদ্রপথে নিঃসৃত রক্তরস নিয়ে বেঁচে থাকে। যে জায়গাটা থেকে চামড়াটা তুলে নেওয়া হয়, সেখানকার ক্ষত আপনা থেকেই পূরণ হয়ে যায়।

বাঁদিকে—কুষ্ঠরোগীর নাক প্লাসটিক সার্জারীর আগে ; ডানদিকে—প্লাসটিক সার্জারীর পরে।

ব্লাড-ব্যাঙ্কে জমা রক্ত থাকে। এই জমা রাখা রক্ত কত রোগীর শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রক্তে টাইপ বা শ্রেণী বিভাগ করা হয়। একই শ্রেণীর রক্ত না হলে রোগীর শরীরে দেওয়া চলে না। 'টিস্যু ব্যাঙ্কে' টিস্যুগুলিকেও তেমনি শ্রেণী বিভাগ করে রাখা হয়। প্রয়োজন মত রোগীর দেহের ক্ষতস্থানে সেটা প্লাসটিক সার্জারীর সাহায্যে জুড়ে দিয়ে জায়গাটিকে প্রায় স্বাভাবিক করে তোলা যায়। পশ্চিম ইউরোপে রক্তের মত 'টিস্যু'ও জমা রাখার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও হয়ত অল্পদিনের মধ্যেই এই 'টিস্যু ব্যাঙ্ক' চালু হবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে
নোবেল পুরস্কৃতের কয়েকজন

সন	নাম	আবিষ্কার
১৯০১	Emil von Behring (জার্মাণ)	সেরাম ঔষধ চিকিৎসা
১৯০২	Sir Ronald Ross (বৃটিশ)	মশা দ্বারা মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ঢোকে
১৯০৩	Niels R. Flusen (ড্যানিস)	আলোর সাহায্যে চর্ম রোগের চিকিৎসা
১৯০৪	Ivan P. Pavlov (রাশিয়ান)	দেহে পরিপাক ক্রিয়া
১৯০৫	Robert Koch (জার্মাণী)	ব্যাকটেরিয়ার কাজ
১৯০৬	Camillo Golgi (ইটালিয়ান)	স্নায়ু মণ্ডলীর গঠন
	Santiago Cajal (স্পেনীস্)	
১৯০৭	Charles Laveran (ফ্রান্স)	রোগ উত্তেজক প্রোটোজোয়া
১৯০৮	Paul Ehrlich (জার্মাণ)	ইমিউনিটি (টিকা)
	Itya MechniKov (রাশিয়ান)	
১৯০৯	Emil Theodor Kocher (সুইস)	থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে অস্ত্রোপচার
১৯১০	Albrecht Kossel (জার্মাণ)	এ্যালবুমিন ও নিউক্লিন
১৯১১	Allvar Gullstrand (সুইডিস)	চোখের ডিয়োপট্রিকস
১৯১২	Alexis Carrel (ফ্রান্স)	রক্তনালী স্থানান্তরিত করা
***	১৯১৫ থেকে ১৯১৮ কোন পুরস্কার দেওয়া হয়নি***	
১৯২২	Archibald V. Hill (বৃটিশ)	পেশীর উত্তাপ উৎপাদন
ঐ	Otto Meyerhof (জার্মাণ)	অক্সিজেন খরচের উপর ল্যাকটিক অ্যাসিডের উৎপাদন নির্ভরশীল
১৯২৩	Sir Grant Banting (কানাডা)	বহুমূত্র রোগের ওষুধ
	J. R. Macleod (বৃটিশ)	
১৯৩০	Karl Landsteiner (আমেরিকা)	মানুষের রক্তের শ্রেণীবিভাগ
১৯৪৪	Joseph Erlanger (আমেরিকা)	নার্ভের পার্থক্য নির্ণয়
	Herbert Gasser (ঐ)	
১৯৫২	Selman A. Waksman (আমেরিকা)	স্ট্রেপটোমাইসিন
১৯৫৬	Werner Frossman (জার্মাণ)	হৃদরোগের চিকিৎসাকৌশল
১৯৫৭	Daniel Bovet (ইটালী)	অ্যালার্জীর ওষুধ ও অস্ত্রোপচারে পেশীকে শিথিল করা
১৯৬৯	Max Delbrueck (আমেরিকা) জার্মানে জন্ম	ভাইরাস—বৃদ্ধি ও আকার
	Salvador Luria (আমেরিকা) ইটালিতে জন্ম	
	Alfred Hershey (আমেরিকা)	